মাধবনারায়ণ।



শ্রীশিশিরকুমার মিত্র বি, এ,
প্রণীত।

—:*:—

১৩৩৬, ১লা আশ্বিন



মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রিণ্টার—শ্রীগোষ্ঠবিহারী মান্না,
মিত্র প্রেস
৩১১, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উৎসর্গ

পরম শ্রদ্ধাস্পদ—

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের

শ্রীচরণকমলেষু—

মহাশয়,—

আপনি কায়স্থ কুলচূড়ামণি! "মাধবনারায়ণের" জীবনী আপনার নিকটে সাদরে গৃহীত হইবে জানিয়া শ্রদ্ধার অঞ্জলি-স্বরূপ এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি আপনার করকমলে অর্পণ করিলাম।

বাণী-সাহিত্যমন্দির,
১৯৭, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্।

বিনয়াবনত নিবেদক—
শ্রীশিশিরকুমার মিত্র।

ভূমিকা।

-:*:-

১৩২৩ সালে এই জীবনী খানির ঘটনাবলী সংগ্রহে আমি প্রথম প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। তখন রায়েরকাঠী-গ্রামের প্রাচীন লোকদিগের মধ্যে শ্রীযুত অম্বুজনারায়ণ রায় চৌধুরী ও শ্রীযুত কৈলাসচন্দ্র মিত্র মহাশয়দ্বয় মাত্র জীবিত ছিলেন। তাঁহাদের নিকট হইতে কতকগুলি তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলাম। তন্মধ্যে শ্রীযুত অম্বুজনারায়ণ রায় চৌধুরী মহাশয়ের নিকট হইতেই অনেক বিষয় জ্ঞাত হই। কিন্তু দৈবদুর্ঘটনা-বশতঃ তখন আমার এই পুস্তক সঙ্কলনে বাধা পড়িল। অতঃপর ১৩৩৪ সালে পুনরায় ইহার উপাদান সংগ্রহে প্রবৃত্ত হই। দুঃখের বিষয় তখন আর শ্রীযুত অম্বুজনারায়ণ রায় চৌধুরী ও শ্রীযুত কৈলাসচন্দ্র মিত্র মহাশয়দ্বয় জীবিত ছিলেন না। সুতরাং ভগ্ন-হৃদয়ে আমি ইহা সঙ্কলনে আবার নিবৃত্ত হইবার উপক্রম করি। কিন্তু সেই সময় অবগত হইলাম যে শ্রীযুত নগেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী মহাশয় পুরাতন বহু বংশের ও রায়েরকাঠীর রাজবংশের ইতিবৃত্ত অবগত আছেন। তাঁহার নিকট আমার মনোগত অভিপ্রায় ব্যক্ত করি। তিনি উৎসাহ সহকারে যাহা যাহা জানেন তাহা আমাকে জ্ঞাপন করেন ও তৎসঙ্গে তাঁহাদের বংশের প্রাচীন হস্তলিখিত ইতিহাসখানি আমাকে প্রদান করেন। তাহাতেই আমি এই গ্রন্থ-প্রণয়নে সমর্থ হইলাম, নচেৎ কোনক্রমেই পারিতাম না। ৺অদ্বৈতনারায়ণ রায় চৌধুরী মহাশয়ের পৌত্র শ্রীযুত নরেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরীর নিকটও ইহার

উপাদান বিষয়ে কতক সাহায্য পাইয়াছি এবং কলিকাতা সিটি কলেজের বাঙ্গলা ও সংস্কৃতের প্রধানতম অধ্যাপক শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী বিদ্যাভূষণ শাস্ত্রী মহাশয় ইহার সঙ্কলনে আমাকে নানাপ্রকারে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। এ জন্য আমি ইঁহাদের সকলের নিকটে চির-কৃতজ্ঞ। সত্য ঘটনা লিপিবদ্ধ করিতে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু মুদ্রাঙ্কনে স্থানে স্থানে ভ্রম প্রমাদ রহিয়াছে। সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণ তাহা নিজ গুণে ক্ষমা করিবেন। মাধবনারায়ণের ফটোর জন্য আমি বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলাম। দুর্ভাগ্য-বশতঃ তাঁহার কোন ফটো পাইলাম না। তবে তাঁহার পরিবারবর্গের মধ্যে যাঁহার যাঁহার ফটো ও দেবমন্দিরাদির ফটো যাহা পাইয়াছি তাহা পুস্তকে সন্নিবেশিত করিলাম।

ভগবৎকৃপায় এক্ষণে "মাধবনারায়ণ" পুস্তকখানি জনসমাজে আদৃত হইলে কৃতার্থ হইব এবং পরিশ্রম সফল মনে করিব।

রায়েরকাঠীর রাজ-বংশের বংশ-তালিকা।

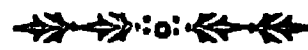
কান্যকুব্জাগত রমানাথ সেন হইতে প্রথম পর্য্যায় লেখা হইল।

(১ প) রমানাথ সেন
(২ প) পুরন্দর সেন
(৩ প) মাধবচন্দ্র সেন
(৪ প) রামনারায়ণ সেন
(৫ প) দিবাকর সেন
(৬ প) ভাস্কর সেন
(৭ প) শ্রীমান সেন
(৮ প) মালাধর সেন
(৯ প) হরিহর সেন
(১০ প) রামগোপাল সেন
(১১ প) শিবভদ্র সেন (দৈত্যারি সেন)

(১২ প) যজ্ঞেশ্বর সেন — হেরম্ব সেন
(১৩ প) শিবশঙ্কর সেন
(১৪ প) রত্নেশ্বর সেন

(১৫ প) ভূঞিয়াকিঙ্কর রায় — বনমালী — গোপাল
(১৬ প) মদনমোহন
(১৭ প) শ্রীনাথ
(১৮ প) শ্রীরাম

মাধবনারায়ণ



প্রথম পরিচ্ছেদ।

জন্মভূমি ও বংশের পরিচয়।

'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী'
—মহর্ষি বাল্মীকি।

বরিশাল জেলার অন্তর্গত রায়েরকাঠী গ্রাম রায়চৌধুরী-বংশীয় যে সকল কীর্ত্তিমান্ পুরুষের অশেষ যশোরশ্মি প্রভাবে বিশদ প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছে, যাঁহাদের মহত্ত্ব, উদারতা, মহানুভবতা, বিদ্যোৎসাহিতা ও ধর্ম্মপরায়ণতা গুণে রায়েরকাঠীর রায়চৌধুরী-বংশ সমাজে প্রভূত খ্যাতি লাভ করিয়াছে, যাঁহাদের আবির্ভাবে রায়েরকাঠী ধন্য ও তত্রত্য রায়চৌধুরী-বংশ গৌরব ও মর্য্যাদার উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছে, মাধবনারায়ণ তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার আদর্শ জীবনের বিবরণ প্রত্যেক ব্যক্তিরই অবশ্য-জ্ঞাতব্য। এই মাধবনারায়ণেরই পূর্ব্বপুরুষ কায়স্থ-কুলাবতংশ শ্রীরাম রায় চৌধুরী বন কাটাইয়া গ্রামের পত্তন করিয়াছিলেন বলিয়া এই স্থানের নাম রায়েরকাঠী হইয়াছে। মাধবনারারণ এই রায়েরকাঠী গ্রামের রায়চৌধুরী-বংশে জন্মগ্রহণ করেন।

মোগল বাদসাহদিগের আমোল হইতে বিশ্ববরেণ্য ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের সুবিশাল সাম্রাজ্য-পত্তনের সূচনাপর্য্যন্ত রায়েরকাঠী সমগ্র পূর্ব্ববঙ্গের মধ্যে একটী বিশিষ্ট সমৃদ্ধিশালিনী নগরী বলিয়া সুপ্রসিদ্ধ ছিল। কাল-চক্রের বিচিত্র বিবর্ত্তনে রায়েরকাঠী এক্ষণে একটী নিতান্ত নিঃস্ব দুরবস্থাপন্ন গ্রামে পরিণত হইয়া পড়িয়াছে। ইদানীং উহার স্থানে স্থানে ভগ্নপ্রাসাদমালার ইষ্টকরাশি, সংস্কারের অভাবে জীর্ণশীর্ণ দেবমন্দিরাবলী এবং পঙ্কপূর্ণ শুষ্কপ্রায় দীর্ঘিকাদি সুদীর্ঘ অতীতের ঐশ্বর্য্য ও সৌভাগ্যের সাক্ষিস্বরূপ বিদ্যমান।

মোগলরাজত্বের শেষভাগে সুবে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর প্রিয়তম দৌহিত্র নবাব সিরাজুদ্দৌলার পরম সুহৃৎ আগা বাখর খাঁ যখন সেলিমাবাদ পরগণা অন্যায়পূর্ব্বক অধিকার করেন, তখন তিনি একটি গঞ্জ স্থাপনা করিয়াছিলেন। উহা তাঁহারই নামানুসারে বাখরগঞ্জ নামে অভিহিত হয়। ক্রমে ঐ গঞ্জ ব্যবসায়-বাণিজ্যাদির প্রধান কেন্দ্র হইয়া উঠে এবং একটী প্রসিদ্ধ নগরে পরিণত হয়।*

কালক্রমে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাখরগঞ্জে জেলা স্থাপন করেন। মাধব নারায়ণের পুণ্য-জন্মক্ষেত্র রায়েরকাঠী প্রথমে বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত ছিল। পরে গভর্ণমেণ্টের শাসন ও সংরক্ষণের সুবিধার জন্য সহরটি বাখরগঞ্জ

* কাহারও কাহারও মতে সম্রাট্ গিয়াসুদ্দীন টোগলগ যখন বঙ্গ পরিদর্শনে আসিয়া-ছিলেন; তখন ঐ স্থানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও অতুল উর্ব্বরতা দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার জনৈক বান্ধবের নামে উহার নামকরণ করিয়াছিলেন। আবার কেহ কেহ বলেন;—সম্রাট্ আলতামাসের জামাতা পাঠান সম্রাট্ গিয়াসুদ্দীন বুলবনের পুত্র সাহজাদা বাখর খাঁ যখন বাঙ্গালার নবাব ছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার নামানুসারে বাখরগঞ্জ নামক গঞ্জ স্থাপিত হইয়াছিল।

হইতে বরিশালে স্থানান্তরিত হয়। রায়েরকাঠী তদবধি বরিশাল জেলার অন্তঃপাতী পিরোজপুর মহকুমার এলেকাভুক্ত একটি গণ্ডগ্রাম মাত্র। পিরোজপুর মহকুমা রায়েরকাঠীর অতি সন্নিকটে অবস্থিত। দামোদর নদ উভয়ের মধ্যে ব্যবধানমাত্র। এই নদ বঙ্গভাগ্যলক্ষ্মী বিশালসলিলা পদ্মার অন্যতম উপনদ বলেশ্বর হইতে নির্গত হইয়া কালীগঙ্গা নাম্নী উপনদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। রায়েরকাঠীর সমৃদ্ধিসময়ে দামোদর বিশাল-কলেবর তরঙ্গসমাকুল দুস্তর নদ ছিল। এক্ষণে উহা একটি সামান্য শীর্ণকায় পয়ঃপ্রণালীতে পরিণত হইয়া স্বীয় জরাজীর্ণ বার্দ্ধক্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে মাত্র। মড়ার উপর খাঁড়ার ঘার মত একটি লৌহ সেতু উত্থিত হইয়া এক্ষণে রায়েরকাঠী ও পিরোজপুরের সংযোজক হইয়া রহিয়াছে।

উত্তরে টেনা নদী, পূর্ব্বে কালীগঙ্গা, দক্ষিণে দামোদর এবং পশ্চিমে বলেশ্বর ও নীমার খাল দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া রায়েরকাঠী পুরাকালের স্বভাবরক্ষিত পুরের ন্যায় সর্ব্বরূপে সুরক্ষিত ছিল। রায়েরকাঠী শুদ্ধ একটী গ্রাম নহে, অনেকগুলি গ্রাম লইয়া উহা গঠিত হইয়াছিল। গ্রামের মধ্য বাহিয়া কয়েকটী সুপ্রশস্ত খাল লহরালীলা-বিলসিত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীগুলির স্বাস্থ্য ও শস্যসম্পৎ সুবিধান করিতে করিতে চারিদিকের নদনদীতে মিলিত হইয়াছিল। একদিন রায়েরকাঠী-নিবাসিগণ স্বাস্থ্যবলে বলীয়ান্, সুজলা-সুফলা-শস্যশ্যামলা জন্মভূমির ঐশ্বর্য্যবলে নিয়ত হর্ষোৎ-ফুল্ল থাকিয়া সর্ব্বদা সর্ব্বদেশের জনগণের আদর্শ বলিয়া পরিগণিত হইতেন।

কিন্তু কালের করাল বিবর্ত্তনে এক্ষণে রায়েরকাঠী তাহার সমগ্র পূর্ব্বতনী সৌভাগ্যলক্ষ্মীর সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্যসম্পৎ হারাইয়া বিশ্ববিনাশক ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি ব্যাধির কবলগত। প্রচণ্ড ব্যাধির

তাড়নে গ্রামবাসীর আর সেই হৃষ্টপুষ্ট দেহ, প্রফুল্ল বদনকান্তি, কর্ম্মকুশলতা প্রভৃতি কিছুই নাই। পয়ঃপ্রণালীগুলি শুষ্ক হইয়া যাওয়ায় গ্রামের উর্ব্বরতাও একেবারে যাইতে বসিয়াছে। সুপেয়-স্বাদু-সলিলনিকেতন রায়েরকাঠী এক্ষণে বিস্বাদ লবণাক্ত অস্বাস্থ্যকর সলিলের নিলয় হইয়া পড়িয়াছে। গ্রামের গৌরব কৃষককুল নির্ম্মূলপ্রায়; শ্রমিকদল দুষ্প্রাপ্য। ফলতঃ যে রায়েরকাঠী একদিন দশ সহস্রাধিক অধিবাসীতে সর্ব্বদা পরিপূর্ণ থাকিয়া একটী সুসমৃদ্ধিশালিনী নগরীরূপে পূর্ব্ববঙ্গের সর্ব্বত্র আদর্শ পুরী বলিয়া পরিগণিত হইত, যথায় নদ নদী খাল ও পয়ঃপ্রণালী সুব্যবস্থিত থাকায় নানা দেশের পণ্যপূর্ণ তরণীমালায় মণ্ডিত হইয়া হাট ও বাজারগুলি সর্ব্বদা সর্ব্বদেশীয় জনবৃন্দের প্রীতিকলরোলে মুখরিত হইত, যথায় রাজ-বাড়ীর কাছারীগুলি শতসহস্র কর্ম্মার্থী পুরুষে পরিবৃত হইয়া প্রভাত হইতে নিশীথ কাল পর্য্যন্ত লোক-সমাগমে পরিপূরিত থাকিত। হায় সেখানে আজ তাহার কিছুই নাই! আছে কেবল শূন্য হাট, বিস্বাদ ও অস্বাস্থ্যকর সলিলযুক্ত শুষ্কপ্রায় খাল, পঙ্কময় নদীতট, আর সর্ব্বহারী বিভীষণ শ্মশানঘাট!

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, রায়েরকাঠী বলিলে মাত্র একটী গ্রাম বুঝায় না। পুণ্যতোয়া কালীগঙ্গার পশ্চিম তীর হইতে বিশালকায় ভৈরবরাবী বলেশ্বরের পূর্ব্বতীরস্থিত যাবতীয় গ্রামগুলিই সর্ব্বত্র রায়েরকাঠী বলিয়া দেশ-বিদেশে সুপরিচিত। বস্তুতঃ ছত্রজিৎপুর, শিকারপুর, ঝাটকাঠী, কুমারখালি, ছোট খলিশাখালি, বড় খলিশাখালি, নরখালি, ওধনকাঠী, লখাকাঠী, মূলগ্রাম, বনবাড়ী, ব্রাহ্মণকাঠী, খুমরীয়া, মুক্তারকাঠী, আলামককাঠী, পাম্বাডুবী প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামগুলির মধ্যবর্ত্তী রায়েরকাঠী তাহার ঐশ্বর্য্যের দিনে তারকা-মালা-পরিবেষ্টিত নিশামণির ন্যায় বিরাজিত ছিল। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ দ্বাদশ ভূঞিয়ার অন্যতম কিঙ্কর রায়ের প্রপৌত্র রাজা শ্রীরাম রায়

প্রথম আবাদ করাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন বলিয়া উহার রায়েরকাঠী (রায়ের কাটী) আখ্যা হয়, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।* এই স্থান পূর্ব্বে সুন্দরী, কেওয়া, গরাণ প্রভৃতি বন্যবৃক্ষে পরিপূর্ণ ও ব্যাঘ্র, মহিষ প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর আবাস-ভূমি ছিল। মহাত্মা ভূঞিয়া কিঙ্করের পুত্র মদন মোহন, তাঁহার পুত্র শ্রীনাথ ও পৌত্র শ্রীরাম ক্রমে ক্রমে এই সব দেশে নানা সমাজ হইতে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, রজক, পরামাণিক ও বিবিধ শ্রেণীর হিন্দু ও মুসলমানদিগকে আনয়ন করিয়া কাহাকেও নিষ্করে এবং কাহাকেও বা অল্প করে তাঁহাদের জমিদারী সেলিমাবাদ প্রভৃতি পরগণার নানাস্থানে বাস করাইতে আরম্ভ করেন।

রায়েরকাঠী সেলিমাবাদ পরগণার অন্তর্গত। মোগলসম্রাট্ আকবরের পুত্র সাহজাদা সেলিমের নামানুসারে এই পরগণার নাম সেলিমাবাদ হয়। ঢাকা নগরী পূর্ব্ববঙ্গের রাজধানী ছিল। সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের নামানুসারে উহার নাম জাহাঙ্গীরনগরে পরিবর্ত্তিত হয়। সেলিমাবদ পরগণা ঢাকার সুবাদার বা নবাবের এলেকা-ভুক্ত ছিল। মহাত্মা রাজা শ্রীনাথ নবাবের নিকট হইতে সেলিমাবাদ প্রভৃতি চতুর্দ্দশ পরগণার মালেকানা-স্বত্বের সনন্দ প্রাপ্ত হইয়া উহাদের শাসন-সংরক্ষণে নিয়োজিত হন। ক্রমে তাঁহার বংশধরগণ পরগণাগুলিকে শাসন-সংরক্ষণের সুবিধার জন্য এরূপ ভাবে মিলিত করিয়া ফেলেন যে, এখন আর এক একটী পরগণার পৃথক্ সীমানির্দ্দেশের চেষ্টা বিফল। আজকাল জমীদারীর কাগজপত্রে "পরগণে সেলিমাবাদ ও গয়রহ" বলিয়াই লিখিত হইয়া থাকে।

---

* ইহার অধিকাংশ স্থান নবাব-প্রদত্ত শ্রীরাম রায়ের তালুকের অন্তর্গত। ইহা ব্যতীত অন্যান্য স্থানেও শ্রীরাম রায়ের তালুক আছে।

রায়েরকাঠীর রায়চৌধুরী বংশের আদিনিবাস দেগঙ্গা পূর্ব্বে হুগলির অন্তর্গত ছিল। এক্ষণে উহা ২৪ পরগণার অন্তর্গত হইয়াছে। এই বংশ দক্ষিণরাঢ়ীয় গোষ্ঠীপতি মৌলিকরাজ বলিয়া সর্ব্বত্র সুবিদিত। বস্তুতঃ দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ সমাজে এমন লোক কেহই নাই যিনি রায়েরকাঠীর রায়চৌধুরীদের পুরাতন কীর্ত্তি-কথা অবগত নহেন।

পূর্ব্বে সেলিমাবাদ প্রভৃতি পরগণা দুর্ব্বৃত্ত আরাকানী, পর্ত্তুগীজ ও পাঠান দস্যুদিগের অত্যাচারে একরূপ জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। সুদূর দেগঙ্গা কিংবা ভুঞিয়া রাজকিঙ্করের পরিগৃহীত আবাসভূমি জগদীশ-পুর হইতে জলযানে আসিয়া ঐ সব দুর্ম্মদ দস্যুদলন করিয়া দেশরক্ষা বড়ই অসুবিধাজনক ছিল। রাজা শ্রীরামের মৃত্যুকালে তিনি তাঁহার পুত্র রুদ্র-নারায়ণকে এতদ্দেশে নিয়ত বাসের জন্য বলিয়াছিলেন। পিতৃভক্ত পুত্র পিতার ঔর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়াসমাপনান্তে স্থায়িবাস-মানসে প্রথমতঃ তাঁহার এলেকাভুক্ত চিরলিয়া পরগণার অন্তর্গত কোঁদলা গ্রামের সন্নিকটে স্থিত একটী রমণীয় স্থানে বসতি-বাটী নির্ম্মাণাভিলাষী হইয়া উহার চতুর্দ্দিকে গড় খনন করিতে আরম্ভ করেন। কতিপয় মাসান্তে প্রোক্ত মহালে বাস করিয়া অন্যান্য পরগণাগুলির শাসন ও সংরক্ষণ অসুবিধাজনক দেখিয়া সেলিমাবাদ পরগণার অন্তর্গত একটি সুচারু স্থান মনোনীত করিয়া তথায় কাছারী-বাটী নির্ম্মাণ করাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু ঐ স্থানে আপাততঃ পোষ্য পরিবারবর্গ আনয়ন স্থগিত রাখিয়া গ্রামটিকে জন-মানব-পরিপূরিত করিবার জন্য বিবিধ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, ধোপা নাপিত, মুসলমান প্রভৃতিকে অল্প করে কিংবা বিনা করে জমি বণ্টন পূর্ব্বক বসবাস করাইতে লাগিলেন। পূর্ব্বে কোঁদলার সন্নিকটে যে স্থানে গড় কাটাইয়াছিলেন উহার নাম খাসবাটি রাখিলেন এবং যে স্থানে বাটী নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছিলেন উহার নাম রাজা রুদ্রনারায়ণের

মহিমা-খ্যাপনার্থে রাজাপুর হইল। রাজাপুরে কাছারী করিবার সময়ে এক রজনীতে রাজা রুদ্রনারায়ণের প্রতি স্বপ্নাদেশ হইল, "দক্ষিণে দামোদর নদ, পূর্ব্বে কালীগঙ্গা নদী এবং পশ্চিমে বলেশ্বর ও নীমার খাল দ্বারা বেষ্টিত ভূভাগে যাইয়া চিরবাস করিলে দৈনন্দিন শ্রীবৃদ্ধি হইবে।" তদনুযায়ী রাজা রুদ্রনারায়ণ নির্দ্দিষ্ট ভূভাগে গমন করিয়া আবাদ করাইতে আরম্ভ করিলেন। রাজা যে স্থানে উঠিয়া প্রথম আবাদ করাইয়াছিলেন তাহার নাম রাখিলেন মূলগ্রাম এবং ঐ স্থানের যে দিকে কাছারী-বাটী নির্ম্মিত করিলেন তাহার নাম হইল নূতন বাটী। তিনি আবাদকালীন ধীবরদিগের জালে কালীগঙ্গা নদীতে একখানি প্রস্তর প্রাপ্ত হ'ন। পরম বিস্ময়ের বিষয় এই যে, সেই রাত্রেই রাজা রুদ্রনারায়ণের প্রতি স্বপ্নাদেশ হইল, "নদীগর্ভে প্রাপ্ত প্রস্তর দ্বারা কালীমাতার মূর্তি প্রস্তুত করাইয়া প্রতিষ্ঠিত কর, তোমার বংশ এস্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে।" ঠিক সেই রাত্রিতেই রাজপুরোহিত রূপচক্রবর্ত্তী মহাশয়ও কূর্ম্মচক্র করিয়া কালিকা-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার নিয়ম ও ক্রমপদ্ধতি সমুদায় স্বপ্নযোগে অবগত হ'ন। পুরোহিত মহাশয় প্রভাতে শয্যাত্যাগ করিয়া স্বপ্নদৃষ্ট সমুদয় বৃত্তান্ত রাজা রুদ্রনারায়ণের শ্রুতিগোচর করিলেন। রাজাও তাঁহার স্বপ্নবৃত্তান্ত তাঁহাকে বলিলেন। অতঃপর মূর্ত্তি-নির্ম্মাতা ভাস্করের বিষয় আলোচিত হইতে হইতে হঠাৎ এক ব্যক্তি আসিয়া কর্ম্মঠ ভাস্কর বলিয়া আত্মপরিচয় দিল। রাজাও দৈবপ্রেরিত মনে করিয়া সেই ভাস্করকে প্রস্তরখণ্ড প্রদানপূর্ব্বক দেবী কালিকার বিগ্রহ নির্ম্মাণ করিতে আদেশ করিলেন। ভাস্কর স্বল্পকালে শাস্ত্রসঙ্গত মহাকালোপরি দণ্ডায়মানা পরমসুন্দরী কালিকামূর্ত্তি ও দেবীর দুই পার্শ্বে দুই শিবলিঙ্গ নির্ম্মিত করিয়া রাখিয়া কোথায় যে অদৃশ্য হইয়া গেল বহু অনুসন্ধানেও উহার তত্ত্ব নির্ণীত হইল না। ইহাতে রাজা বড়ই চিন্তাকুল হইয়া পড়িলেন। পরিশেষে ভগবতী

কালিকাদেবী রাত্রিতে স্বপ্নযোগে দেখা দিয়া বলিলেন—"বৎস, তোমার ধর্ম্মনিষ্ঠা ও সত্যপরায়ণতায় আমি পরম প্রীত হইয়া তোমাকে স্বপ্ন প্রদান করিয়া এখানে আনিয়াছি এবং আমায় ইচ্ছায়ই এই কালীমূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছে। তোমার চিন্তিত হইবার কোনই কারণ নাই। এই বিগ্রহ এখানে প্রতিষ্ঠিত করিয়া বংশপরম্পরাক্রমে সুখে স্বচ্ছন্দে বাস কর। কোনও ভীতি বা আশঙ্কার কারণ নাই। তুমি যখন যে বিপদে পড়িবে কিন্তু আমি রক্ষা করিব। তোমার বংশধরগণও সুখে ও স্বচ্ছন্দে থাকিবে। কৌলিক আচার ও ধর্ম্মাচরণে ভ্রষ্ট হইলেই উহাদের পতন অবশ্যম্ভাবী।" রাজা প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে পুরোহিত ও কর্ম্মচারীদের তাবৎ স্বপ্নবৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলেন। জগন্মাতা কালীমূর্ত্তি অদ্যাপি রায়েরকাঠীতে বিদ্যমান আছেন। আব্রাহ্মণ সর্ব্বশ্রেণীর লোকের পূজার ও ভোগদানের সুবিধার জন্য বিগ্রহ পুরোহিত রূপচক্রবর্ত্তীর নামে প্রতিষ্ঠিত হইল। পুরোহিত রূপচক্রবর্ত্তী এখানে যোগসিদ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়া রায়েরকাঠীর দেবীবিগ্রহ সিদ্ধেশ্বরী বলিয়া সর্ব্বত্র বিদিত।

রাজা রুদ্রনারায়ণ নদীর তীর হইতে গ্রামের চারিদিক মুসলমান অধিবাসীদিগের দ্বারা বেষ্টিত করিয়াছিলেন। মুসলমানদিগের পর নমঃশূদ্র, তার পর বারুজীবী, কুম্ভকার, কর্ম্মকার, তৈলিক, মালাকার, শিবিকা-বাহক, চর্ম্মকার, যোগী, রজক ও পরামাণিক, পরে ব্রাহ্মণ এবং একদিকে বঙ্গজ কায়স্থ এবং মধ্যস্থলে রাজবাটী প্রতিষ্ঠিত করিলেন। রাজবাড়ীর চারিদিকে দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ কুলীন মহাশয়দের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। রাজবাড়ীর পশ্চিমে দক্ষিণ রাঢ়ীয় মৌলিক কায়স্থ দেওয়ান মহাশয়দের বাটীকরাইয়া ছিলেন। রাজগুরু পূজ্যপাদ ষষ্ঠীদাস ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় সপরিবারে রাজবাড়ীর পূর্ব্বদিকে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। এইরূপে রাজা রুদ্ররারায়ণ ক্রমে ক্রমে স্বরচিত বাসস্থানকে একটী সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন নগরীতে উন্নীত

করিয়াছিলেন। পুষ্করিণী, দীর্ঘিকা, দেবালয়, পান্থশালা, আয়ুর্ব্বেদ-চিকিৎসালয়, সংস্কৃত চতুষ্পাঠী প্রভৃতিতে পরিশোভিত রাজার রায়েরকাঠী সর্ব্বত্র সুবিখ্যাত হইয়া উঠিল। মুসলমান ও নমঃশূদ্রগণ লাঠিয়ালের কার্য্য করিত এবং অস্ত্রচালনা ও মল্লযুদ্ধ শিক্ষা করিত। চতুর্দ্দিকে নদীরক্ষিত হওয়ায় রায়েরকাঠীর জন্য আর কৃত্রিম গড়খননের আবশ্যকতা হইল না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মাধবনারায়ণ বঙ্গাব্দ ১২৪০ সালে রায়েরকাঠী নিজ বাটীতে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার জনক মহেন্দ্রনারায়ণ এবং জননী মহেন্দ্রনারায়ণের দ্বিতীয়া পত্নী অম্বিকা চৌধুরাণী। মহেন্দ্রনারায়ণের প্রথমা পত্নী তারা-সুন্দরী গৌরসুন্দরীনাম্নী এক কন্যা ও রাজেন্দ্রনারায়ণ নামে এক পুত্র রাখিয়া অকালে পরলোক গমন করেন। সাধ্বী পত্নীর আকস্মিক অকাল-মৃত্যুতে মহেন্দ্রনারায়ণ বড়ই বিপন্ন হইয়া পড়েন। এক দিকে বিপুল দায়িত্বপূর্ণ জমিদারি-সংক্রান্ত কার্য্য-কর্ম্ম-পর্য্যবেক্ষণ, অপর দিকে সুবৃহৎ পরিবারের বিবিধ কর্ত্তব্য-পালন এবং মাতৃহীন কন্যা ও পুত্রের লালন-পালন, সর্ব্বোপরি দারুণ পত্নী-বিয়োগ শোক,—এই সকল কারণে বস্তুতঃ মহেন্দ্রনারায়ণের গৃহ হতশ্রী হইয়া পড়িল. অতঃপর নিতান্ত অনন্যোপায় হইয়া মহেন্দ্রনারায়ণ বাঘুটিয়া-নিবাসী কনিষ্ঠ কুলীন জগন্মোহন ঘোষ মহাশয়ের সর্ব্বসুলক্ষণা কন্যা শ্রীমতী অম্বিকার পাণিগ্রহণ করেন। অম্বিকা বাস্তবিকই অম্বিকা, রূপে ও গুণে অনুপমা এবং দয়া-মায়ার প্রতিমারূপিণী ছিলেন। তাঁহার আগমনে মুহ্যমান মহেন্দ্র-নিকেতন প্রীতির আলোকে ও স্বস্তির বাতাসে আবার প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। কালক্রমে অম্বিকা চৌধুরাণীর গর্ভে চারি কন্যা ও তিন পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। গৃহলক্ষ্মী পুত্র ও কন্যাদের দ্বারা পূর্ণ করিয়া গৃহের শোভা শতগুণ সংবর্দ্ধিত করিলেন।

মহেন্দ্রনারায়ণও নবপত্নীর অপার্থিব পবিত্র প্রেমে, অসাধারণ গৃহ-রক্ষার নৈপুণ্যে এবং সপত্নী-পুত্রকন্যাগণের লালন-পালনে নিদারুণ পত্নীশোক ক্রমশঃ বিস্মৃত হইতে লাগিলেন।

অম্বিকার প্রথমা কন্যা সখীসুন্দরী, দ্বিতীয়া হরসুন্দরী, তৃতীয়া বামা-সুন্দরী এবং চতুর্থী ক্ষমাসুন্দরী। পুত্রদিগের মধ্যে প্রথম প্রহ্লাদ-নারায়ণ ১২৫০ সালে জন্ম গ্রহণ করেন এবং যৌবনের প্রারম্ভে দারগ্রহণের পূর্ব্বেই ১৭৬৭ শকে (বাঙ্গালা ১২৫২ সালে) কাল-কবলে নিপতিত হন। প্রহ্লাদ-নারায়ণ অতি সুপুরুষ ছিলেন। দ্বিতীয় মাধবনারায়ণ ও তৃতীয় নরনারায়ণ সুদীর্ঘ কাল সংসার-ধর্ম্ম পালন করেন। প্রথম পক্ষের পুত্র রাজেন্দ্রনারায়ণ অপুত্রক ছিলেন। সারদাসুন্দরী নাম্নী একমাত্র কন্যাই তাঁহার বংশধরী ছিলেন। প্রহ্লাদনারায়ণের মৃত্যুর দুই বৎসর অতীত হইতে না হইতেই ১৭৬৯ শকাব্দে (বাঙ্গালা ১২৫৪ সালে) আশ্বিন মাসে মহানবমী তিথিতে রাজেন্দ্রনারায়ণ পরলোক গমন করেন। দস্যু-তস্করগণ তাঁহার শাসন-ভয়ে সর্ব্বদা শঙ্কিত থাকিত। তিনি একটি হাট বসাইয়াছিলেন; উহার নাম রাজার হাট ছিল। এই হাটের বালাম চাউলের সবিশেষ খ্যাতি ছিল। উপর্য্যুপরি দুই পুত্র-শোকে মহেন্দ্রনারায়ণ অতিশয় কাতর হইয়া পড়িলেন। তাঁহার শরীর ভগ্ন হইল, বিপুল মানসিক শক্তি বিলয় প্রাপ্ত হইল। প্রহ্লাদের শোক-সম্বরণে সমর্থ হইলেও কুল-প্রদীপ জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজেন্দ্রের শোক আর তিনি সহিতে পারিলেন না। দুই বৎসর অতীত হইতে না হইতেই ১৭৭১ শকাব্দে (বাঙ্গালা ১২৫৬ সালে) ১লা শ্রাবণ আষাঢ়ী কৃষ্ণা একাদশী তিথিতে ৬৫ বৎসর বয়সে মহাপুরুষ মহাপ্রস্থান করিলেন।

মহেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী-বংশের মধ্যে একজন ক্ষমতাশালী ও সম্পত্তিশালী জমিদার ছিলেন। তিনি অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপুঞ্জের পালনে যেমন বিচক্ষণ ছিলেন, শাসন-সংরক্ষণেও সেইরূপ তেজস্বী পুরুষ

ছিলেন। এই বিচক্ষণতা ও তেজস্বিতা-গুণে তিনি বিপুল সম্পত্তি অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মহেন্দ্রনারায়ণ যেরূপ সুশ্রী ও গৌরকায় পুরুষ ছিলেন সেইরূপ অসাধারণ শারীরিক বলেও বলীয়ান ছিলেন। সর্ব্বোপরি সত্যবাদিতায় তিনি একজন আদর্শ পুরুষ ছিলেন। সুচিক্কণ ভ্রমর-নিন্দিত কেশরাশি তাঁহার পৃষ্ঠদেশ পর্য্যন্ত বিলম্বিত ছিল।* দীর্ঘ-বাহু, গৌরকলেবর, প্রশস্তললাট মহেন্দ্রনারায়ণের সৌন্দর্য্যের প্রশংসা সকলেই করিত এবং তাঁহার ভ্রূ-যুগ্ম-শোভিত নয়নদ্বয় ও সুবিশাল বক্ষঃস্থল তাঁহার বীরোচিত ভাব ব্যক্ত করিত। মহেন্দ্রনারায়ণের নিত্য হাস্যময় মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ সকলে শুভ বলিয়া মনে করিত। কন্যাদায়, মাতৃ-পিতৃ-শ্রাদ্ধদায়, কি যজ্ঞোপবীত কিংবা অন্য কোন গুরুতর দায়গ্রস্ত হইয়া যাঁহারা মহেন্দ্রনারায়ণের নিকট উপস্থিত হইতেন, তিনি জাতিনির্ব্বিশেষে তাঁহাদিগকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে কুণ্ঠাবোধ করিতেন না। এরূপ পরোপকারী দাতার মৃত্যুতে এদেশস্থ ও অন্যদেশস্থ অনেকেই অশ্রুবর্ষণ করিয়াছিলেন।

দানবীর মহেন্দ্রনারায়ণ এইরূপ অবিরত বদান্যতায়, জ্ঞাতি-বিরোধে এবং অন্যান্য জমিদারদিগের সহিত বিরোধে প্রায় দুই লক্ষ টাকা ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়েন। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছায় ঋণ-পরিশোধের ব্যবস্থা করিবার সময়েই কঠোর কাল তাঁহাকে ইহলোক হইতে অপসারিত করেন।

মহেন্দ্রনারায়ণের জীবদ্দশাতেই তাঁহার প্রথম পক্ষের পুত্র ও কন্যাগণের শুভবিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল। প্রথম পক্ষের প্রথমা কন্যা গৌরসুন্দরীর বিবাহ দেন যশোহর জেলার অন্তর্গত বাঘুটিয়া-নিবাসী প্রকৃত কুলরাজ

* তখনকার দিনে মস্তকে দীর্ঘ কেশ রাখিবার প্রথা ছিল। ভদ্রলোকের ভিতরেও এ প্রথার ব্যতিক্রম ছিল না। এমন কি রাজপুতনার ক্ষত্রিয় রাজগণ মস্তকে দীর্ঘকেশ ধারণ করিতেন। এখনও শিখ সম্প্রদায়ের মধ্যে এই প্রথা বিদ্যমান আছে।

চণ্ডীচরণ ঘোষের পুত্র কৃষ্ণচরণ ঘোষের সহিত এবং পুত্র রাজেন্দ্র নারায়ণের বিবাহ দেন যশোহর জেলার অন্তর্গত জঙ্গলবাঁদাল-নিবাসী শম্ভুচন্দ্র বসুর কন্যা শিবশঙ্করীর সহিত। শিবশঙ্করীর পুত্রসন্তান না হওয়ায় খুলনা জেলার অন্তর্গত গোটাপাড়া-নিবাসী মধ্যাংশ দ্বিতীয়ের পো কুলীন রামচাঁদ বসুর কন্যা দয়াময়ীর সহিত পুনরায় বিবাহ দিলেন। দ্বিতীয় পক্ষের তৃতীয়া কন্যা বামাসুন্দরী বিবাহের পূর্ব্বেই ইহলোক ত্যাগ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় পক্ষের প্রথমা কন্যা অনুপমরূপলাবণ্যবতী সখীসুন্দরীর বিবাহ দিয়াছিলেন হুগলি জেলার অন্তর্গত কোন্নগর-নিবাসী সহজ মুখ্য কুলীন কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের সঙ্গে ; দ্বিতীয়া কন্যা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী হরসুন্দরীর সহিত হুগলি জেলার দশঘরা-নিবাসী কোমল মুখ্য কুলীন ঈশানচন্দ্র ঘোষের পুত্র উমাচরণ ঘোষ মহাশয়ের শুভবিবাহকার্য্য সম্পন্ন করেন ; চতুর্থী দুহিতা সুশীলা ক্ষমাসুন্দরীকে কোন্নগর-নিবাসী কোমল মুখ্য কুলীন হরিমোহন ঘোষ মহাশয়ের সহিত বিবাহ দিলেন। এই সকল বিবাহ উপলক্ষে মহেন্দ্রনারায়ণ জামাতা ও কন্যাদিগকে যেমন বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কার প্রদান করিয়াছিলেন, তদনুরূপ ভোজন এবং আমোদ-প্রমোদ ও বাজি-বাজনা ইত্যাদিতেও প্রচুর অর্থব্যয় করেন। দ্বিতীয় পক্ষের পুত্রদ্বয় নাবালক থাকা হেতু মহেন্দ্রনারায়ণ তাহাদিগের শুভবিবাহকার্য্য সম্পাদন করিয়া যাইতে পারেন নাই। প্রথম পক্ষের কন্যা ও জামাতাকে তাঁহার তেলিখালি নামক তালুক হইতে বাৎসরিক এক হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি প্রদান করেন।* অন্যান্য জামাতা ও কন্যাদিগের প্রত্যেককে তাঁহার জোলাগাতি ও চিংড়াখালি এবং নাগুঁলি ও মুক্তার কাঠি নামক

* এই সম্পত্তি এখনও উক্ত ঘোষ মহাশয়ের বংশধর বাঘুটিয়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল ঘোষ প্রভৃতি ভোগদখল করিতেছেন।

তালুক হইতে পাঁচ শত টাকা করিয়া বাৎসরিক আয়ের সম্পত্তি দিয়াছিলেন।‡

কীর্ত্তিমান্ কিঙ্কর ভূঞিয়ার বংশে জ্যেষ্ঠ-গৃহে মাধবনারায়ণ জন্মগ্রহণ করেন। তখন তাঁহার পিতা মহেন্দ্রনারায়ণ ও অগ্রজ রাজেন্দ্রনারায়ণ পূর্ণপ্রতাপবান্, জননী অম্বিকা চৌধুরাণী, ভগিনীত্রয় ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনগণে গৃহ পরিপূর্ণ। এই সময়ে তাঁহার জন্ম হওয়ায় গৃহমধ্যে কিরূপ প্রীতি ও উৎসবের উৎস সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা কেবল কল্পনার বিষয়। অন্নপূর্ণা-মূর্ত্তি জননী অম্বিকার অঙ্কমধ্যে নবোদিত শশিকলার ন্যায় শিশুকে বিরাজিত দেখিয়া পিতা কি অপার অপার্থিব প্রীতি-পারাবারে নিমগ্ন হইয়াছিলেন তাহা কল্পনাতীত। অগ্রজ ও সহোদরাগণ অপার আনন্দোৎসবে চারিদিকে ছুটিয়া বেড়াইতেছিলেন; এমন কি নব অতিথির আগমনে গৃহমধ্যে কি সুখ-সুধাসাগর উথলিত হইয়াছিল তাহা বর্ণনার অতীত, শুধু প্রণিধানযোগ্য। ঢাক, ঢোল, টিকারা, কাড়া, শানাই প্রভৃতির উন্মাদন বাদ্য, স্তব, স্তোত্র, সঙ্গীত প্রভৃতির মধুর ধ্বনি, প্রভূত অন্নবস্ত্র ও ধনরত্নবিতরণ এবং সংখ্যাতীত লোকজনের প্রীতি-কলরবে বড় হিস্যা কয়েক দিন যাবৎ যে কিরূপ পরিপূরিত ছিল তাহা বলাই বাহুল্য।

‡ দ্বিতীয় পক্ষের কন্যা সখীসুন্দরী ও ক্ষমাসুন্দরীর ওয়ারিসগণ উক্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া যান। কিন্তু হরসুন্দরীর অন্য কোনও ওয়ারিস না থাকায় তাঁহার মৃত্যুর সময়ে তিনি তাঁহার সম্পত্তি নরনারায়ণ রায়চৌধুরীর কন্যা কুসুমকুমারীকে দান করিয়া যান।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মহেন্দ্রনারায়ণের পরলোক-প্রাপ্তির পর তাঁহার নিতান্ত হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুগণ তাঁহার পুত্রযুগলকে অপ্রাপ্তবয়স্ক ও তাঁহার এষ্টেট গুরুতর ঋণভার-গ্রস্ত দেখিয়া বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। অম্বিকা চৌধুরাণী দেবী অন্নপূর্ণার ন্যায় নিরাশ্রয়ের আশ্রয় ছিলেন বটে, কিন্তু বিষয়-কার্য্যের কিছুই জানিতেন না; বিশেষতঃ আশ্রয়-শাল-তরুর নিপাতে নাবালক পুত্রদিগকে লইয়া তিনি বড়ই বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। তখন স্বর্গীয় রাজার* নিতান্ত হিতকাঙ্ক্ষী সুহৃৎ ভূকৈলাসের রাজা বাহাদুর সত্যশরণ ঘোষাল, বরিশালের ডেপুটী কলেকটর রেলি সাহেব, কাউখালি সব ডিভিশনের মুন্‌সেফ শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র বিদ্যারত্ন‡ ও জজ কোর্টের উকীল মৌলবী তোফেল মহম্মদ মহেন্দ্রনারায়ণের এষ্টেট কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের হস্তে প্রদান করিয়া উহা রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টিত হইলেন। এদিকে কর্ম্মচারিগণ

---

* যদিও রায়েরকাঠীর রায়চৌধুরীদিগের রাজা উপাধি রাজা জয়নারায়ণ হইতে চিরতরে বিলুপ্ত হইয়াছিল, তথাপি পরগণাশুদ্ধ লোক, এমন কি, ভিন্ন পরগণার লোকেরাও উঁহা-দিগকে রাজা বলিয়াই সম্বোধন করেন। এই জেলার ডিপুটী ও মুনসেফ বাবুরা, কি অন্যান্য ব্যক্তিরাও এখনও ইঁহাদিগকে রাজা বলিয়া সম্বোধন করেন এবং ইঁহাদিগের বাটীকে রাজবাটী বলিয়া থকেন।

‡ তিনি পরে বরিশালের সদর আলা (সাব জজ) পদে উন্নীত হন।

দেখিলেন, এষ্টেট কোর্ট অফ ওয়ার্ডসে যাইলে তাঁহাদের অর্থাগমের উপায় ও প্রভুত্ব সকলই চলিয়া যায়, তাই তাঁহারা উহা যাহাতে কোর্ট অফ ওয়ার্ডস-ভুক্ত না হয় তাহার জন্য নানাবিধ ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। গ্রামের দুই চারিজণ সেকালের বৃদ্ধ—যাঁহারা এখনও জীবিত আছেন, তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, দুষ্ট কর্ম্মচারিগণ যখন দেখিলেন, এষ্টেট কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের হাত হইতে কিছুতেই রক্ষা করিতে পারিতেছেন না, তখন তাঁহারা রাণী অম্বিকা চৌধুরাণীর নিকটে গিয়া তাঁহাকে বুঝাইলেন. রাজার সম্পত্তি কোর্ট অফ ওয়ার্ডসে যাইলে রাজাবাবুদের ঢাকায় লইয়া যাইবে, রাণীমা আর তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইবেন না, এমন কি, দেহ-ত্যাগের পর মুখাগ্নিকার্য্যও পুত্রগণ দ্বারা হইবে না। তার পর বিষয়-সম্পত্তিও আর রাজাবাবুরা কখনও ফিরিয়া পাইবেন না।

পুত্রবৎসলা ধর্ম্মপ্রাণা সরলহৃদয়া রাণী অম্বিকা চৌধুরাণী স্বার্থপর দুরাত্মা কর্ম্মচারীদিগের দুরভিসন্ধি বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাদের কথায় বিশ্বাস স্থাপনপূর্ব্বক এষ্টেট কোর্ট অফ ওয়ার্ডসে দিবার প্রতিপক্ষে দণ্ডায়মান হইলেন। পুত্র-বিচ্ছেদ ও স্বর্গীয় পতির বিষয়-সম্পত্তি চিরতরে সরকার বাহাদুরের হস্তগত রাখা তাঁহার পক্ষে নিতান্ত অসহ্য হইল। সুহৃদ্‌গণও এষ্টেট কোর্ট অফ ওয়ার্ডসে প্রদানে রাণীমার অমত জানিয়া উহা হইতে বিরত হইলেন। সুতরাং মাধব-জননী রাণী অম্বিকা নাবালকদিগের অভিভাবিকা হইলেন এবং মন্দমতি দুষ্ট কর্ম্মচারীদিগের ষড়যন্ত্র সিদ্ধ হইল। ইহার ফলে তাঁহাদের নির্ব্বিবাদে অসদুপায়ে অর্থাগমের পথ পরিষ্কৃত হইল।

রাণী অম্বিকা যথা সময়ে স্বর্গগত স্বামীর আত্মশ্রাদ্ধ বংশানুক্রমিক নিয়মে পুত্রদিগের দ্বারা সম্পাদিত করাইলেন। এই শ্রাদ্ধ উপলক্ষে গো, হস্তী, শিবিকা, নৌকা, শালগ্রাম, স্বর্ণরৌপ্যনির্ম্মিত ষোড়শ দান ও বৃষোৎসর্গ

পূর্ণোপচারে হইয়াছিল। কাশী, কাঞ্চী, মিথিলা, দ্রাবিড়, নবদ্বীপ এবং বঙ্গের অন্যান্য দেশবাসী পণ্ডিতমণ্ডলীকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাদের যাবতীয় পাথেয় ও ২০৲ টাকা হারে দান করিলেন এবং ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও নানা শ্রেণীস্থ লোকদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করাইলেন। এতদ্ব্যতীত গরীব-দুঃখীদিগকেও প্রচুর অর্থদান ও ভোজন করাইয়া মুক্ত আত্মার আত্মকৃত্য সমাপন করিলেন।

রাণী অম্বিকা স্বামীর শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সমাপন করিয়া পুত্রদিগের শিক্ষার জন্য প্রথমতঃ একজন গুরুমহাশয় নিযুক্ত করিলেন। তাঁহার নিকট পাঠ সমাপন হইলে একজন সুচরিত্র এবং সুশিক্ষিত মুন্সী নিযুক্ত করিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় তুরীয়াংশের প্রথম ভাগে মাধবনারায়ণের জন্ম হয়। সে সময়ে ও বর্ত্তমান কালে সামাজিক শিক্ষাদীক্ষা, জীবনযাপন, সভ্যতা ও অন্যান্য বিষয়ে বিষম পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তাই আমরা মাধবনারায়ণের বাল্য ও কৈশোরের আখ্যান প্রদান করিবার পূর্ব্বে সেকালের সমাজসম্বন্ধে দুইচারিটি কথা লিপিবদ্ধ করিতেছি; কেন না, এইকথাগুলি পূর্ব্বে না জানিলে তাঁহার জীবনী বুঝিতে পাঠকবর্গের নিতান্ত অসুবিধা হইবে।

আজকাল যেমন ইংরাজী শিক্ষা এবং য়ুরোপীয় সামাজিক বিধান দ্বারাই মানুষের জ্ঞান ও সভ্যতার পরিমাপ হইয়া থাকে, তখন মুসলমান-শাসনকাল শেষ হইয়া গেলেও পারসী ও আরবিক শিক্ষা লোকের জ্ঞান ও সভ্যতার পরিমাপক ছিল। উহার সঙ্গে সংস্কৃত শিক্ষা ও উহার অনুশীলন থাকিলে সোনায় সোহাগার ন্যায় আর কোনই কথা থাকিত না। এখন যেমন কোট, প্যাণ্ট, হ্যাট, বিলাতী জুতা প্রভৃতি পরিধান উচ্চ সভ্যতার পরিচায়ক, তখন তেমনি মোগলাই কেতায় সরু ইজার, আচ্‌কান, তাজ, নাগরাই জুতা পরিধানই নাগরিক সভ্যতার সূচনা করিত। এখন যেমন

চপ, কাটলেট, রোষ্ট, কারি, ষ্টু, ডেভিল ও অন্যান্য য়ুরোপীয় আহার্য্য অতি উচ্চাঙ্গের খাদ্য বলিয়া পরিগণিত, তখন তেমনি লুচী, মোণ্ডা, পোলোয়া, খিচুড়ী, সন্দেশ, রসগোল্লা, কালিয়া, কোপ্তা, ও অন্যান্য নানাবিধ মোগলাই আহার্য্য বড় লোকের খাদ্য বলিয়া গণ্য হইত। এখন যেমন সংবাদপত্রে প্রত্যহ পৃথিবীর সর্ব্বদেশের সমুদায় খবর পাঠ করিয়া লোকে তৃপ্তি পায়, তখন তেমনি গ্রামে গ্রামে প্রতি আড্ডায় বসিয়া কিংবা বড়-লোকের বৈঠকখানায় বসিয়া পাঁচ জনে মিলিয়া সংসারের সমস্ত খবরের আলোচনা করিত। এখন যেমন ছেলেদের পাঁচ বৎসর হইতে না হইতে জনকজননী তাহাদিগকে ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট করাইয়া নিশ্চিন্ত হ'ন, তখনও তেমনি পাঁচ বৎসরে হাতে খড়ি দিয়া পিতামাতা ছেলেদের মুন্সীমহাশয়ের পাঠশালায় পাঠাইয়া দিতেন। সেখানে বাঙ্গালা, পারসী ও আরবী শিক্ষা দেওয়া হইত। এখনকার মত তখন শিক্ষা এত সুগম ছিল না; নিতান্ত বড় লোক বা নিতান্ত মেধাবী ভিন্ন অন্য কোন বিদ্যার্থী উচ্চ বিদ্যালাভ করিতে পারিত না। তখনও সর্ব্বত্র রেলপথ প্রসারিত ও বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় নাই এবং সরকার বাহাদুর উচ্চ শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করিতে পারেন নাই। কেবল বড় লোকই গ্রামের পাঠশালায় বিদ্যালাভ শেষ করিয়া দূরতর সহরে যাইয়া উচ্চ অধ্যয়ন পরিসমাপ্ত করিতে পারিত। এখন সুদূর পল্লী পর্য্যন্ত রেল ও ষ্টীমার দ্বারা যাতায়াতের সুবিধা এবং গ্রামে গ্রামে উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় গ্রামের ও সহরের শিক্ষা-দীক্ষা ও সভ্যতার তাদৃশ প্রভেদ বা বৈলক্ষণ্য পরিলক্ষিত হয় না। তখন কিন্তু এমন ছিল না; গ্রামের লোকে ও নাগরিকে বিষম বৈষম্য পরিদৃষ্ট হইত। শিক্ষা ও সভ্যতার সঙ্গে আমোদ-উৎসবেরও বিলক্ষণ প্রভেদ ছিল। যাতায়াতের সুবিধা না থাকায়, নদী-মাতৃক দেশবাসী সহর হইতে শিক্ষা ও সভ্যতায় অনেক নিম্নস্তরে অবস্থান করিত। কবি, তরজা,

ঝুমুর, ভাঁড়, নাচ প্রভৃতি নিতান্ত অশ্লীল সঙ্গীত-উৎসবে পিতা পুত্র, ভাই ভাই একত্র হইয়া যোগদান করিতে একটুও ইতস্ততঃ করিতেন না। গ্রামে যাতায়াতের পথ-ঘাট প্রায় থাকিত না। তবে তখনকার গ্রামবাসীদের প্রাণ ছিল; গ্রামের হিতকল্পে সকলেই সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতেন। সরলতা, সত্যনিষ্ঠা, নির্ভীকতা, পরোপকার প্রভৃতি সদ্ভাবগুলি গ্রামের সর্ব্বত্র প্রায় সর্ব্বজনে লক্ষিত হইত। গার্হস্থ্য পূজা, উৎসব প্রভৃতি কার্য্যে বড় লোকের বাড়ীতে ইতর লোকগণ সাদরে গৃহীত ও আপ্যায়িত হইত। তখন সমাজ জীবিত ছিল. সুতরাং সমাজস্থ প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গও স্বাস্থ্যবান্ ছিল। কন্যাদায়গ্রস্ত কাহাকেও তখন অহিফেন সেবনে কিংবা উদ্বন্ধনে পিতা ও পুত্রী উভয়ের প্রাণের স্নেহ চিরনির্ব্বাপিত করিতে হইত না। যে কেহ যে-কোন দায়ে পড়িয়া ক্ষমতাবানের আশ্রয় চাহিতেন, তিনি খনই তাঁহাকে আশ্রয় দিয়া তাঁহার সেই অভাব মোচন করিতেন; কেন না, তখন যাঁহার আশ্রয়ে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লোক থাকিত, সমাজে তিনিই শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইতেন।

এই সমাজ ও সভ্যতার যুগে মাধবনারায়ণ ধনী জমীদারগৃহে জন্মগ্রহণ করেন। পুরাতন খ্যাত জমীদারের আদরের-পুত্র, সুতরাং তাঁহার শিক্ষা ও মনুষ্যত্বের জন্য কত যত্ন ও অর্থব্যয় হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। অভিজ্ঞ সুবিদ্বান্ চরিত্রবান্ মুন্সী রাখিয়া তাঁহার লেখাপড়া আরম্ভ হয়। মাধবনারায়ণ তাঁহার নৈসর্গিক বর্ণে ও অঙ্গসৌষ্ঠবে রূপবান্ মহেন্দ্রনারায়ণকেও অতিক্রম করিয়াছিলেন। বাল্যকালেই তাঁহাকে দেখিয়া আর কেহ চোখ ফিরাইতে পারিত না। আবার যেমন দেবদুর্লভ তাঁহার আকৃতি, সেইরূপ কথাগুলিও অতি মধুর, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মেধা ও ধীশক্তি অনন্যসাধারণ ছিল। অতি অল্পবয়সেই তিনি মুন্সী সাহেবের নিকট পারসী ও আরবী এবং হিন্দী শিখিয়া ফেলিলেন। হিন্দু গুরুমহাশয়ের

নিকটে তিনি বাঙ্গালা রামায়ণ, মহাভারত পাঠ করিতে শিক্ষা করিলেন এবং জমাদারী ও মহাজনী শিক্ষায়ও সুদক্ষ হইলেন। তাঁহার শিক্ষা আজকালকার ন্যায় অসম্পূর্ণ ছিল না। তিনি যেমন পারসী, আরবী ও হিন্দী গ্রন্থের অর্থ বুঝিতে পারিতেন, সেইরূপ পাকা মুন্সাদের ন্যায় ঐ তিন ভাষায় প্রবন্ধ রচনা ও বক্তৃতা করিতে পারিতেন। হিসাব-পত্রেও তাঁহার অসাধারণ দক্ষতা ছিল। এই সমুদায় শিক্ষা সমাপ্ত হইলে মাতা অম্বিকা চৌধুরাণী মাধবনারায়ণের শিক্ষার জন্য একজন সুদক্ষ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত নিযুক্ত করিলেন। তিনি মাধবনারায়ণকে বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পড়াইতেন। মাধবনারায়ণ অতি অল্প কালেই ক্রমে বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষায় পাণ্ডিত্য লাভ করিলেন। সংস্কৃত-পাঠাভ্যাস তাঁহার শেষ জীবন পর্য্যন্ত ছিল। তাঁহার মেধাশক্তি এরূপ ছিল যে, সংস্কৃত পণ্ডিতগণ তাঁহাকে শ্রুতিধর বলিতেন। আজকাল যেমন মিশ্র সুরের প্রবাহে প্রকৃত সুরজ্ঞের অসদ্ভাব ঘটিতেছে, সে কালে তাহা ছিল না। প্রকৃত খাঁটি সুরের শিক্ষা খাঁটি সুরজ্ঞের নিকট শিক্ষা করিতে হইত, সুর-সমুদ্রের অগাধ সলিলে সন্তরণপটু হইতে হইত। সফরীর ন্যায় গণ্ডূষজলে ফর-ফরায়মাণ ব্যক্তি অতি হেয় বলিয়া বিবেচিত হইত। রসজ্ঞ মাধবনারায়ণ সঙ্গীত-চর্চ্চায়ও পরাঙ্মুখ ছিলেন না। প্রত্যুত সেতার-যন্ত্র-বাদনে তিনি যেরূপ সিদ্ধহস্ত হইয়াছিলেন, সেরূপ বাদ্যকর আজকাল বিরল। দূর দূরান্তর হইতে সঙ্গীতজ্ঞগণ তাঁহার সেতারের ঝঙ্কার ও মূর্চ্ছনা শুনিবার নিমিত্ত রায়েরকাঠীতে প্রায়ই আসিতেন ও মুগ্ধ হইয়া ফিরিতেন। বিধাতার সৃষ্টিতে রূপ ও গুণের একাধারে সমাবেশ প্রায়ই দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু এই অনন্যসাধারণ দুইটি ধর্ম্ম একমাত্র মাধবনারায়ণেই পরিলক্ষিত হইত। সুতরাং যৌবন-প্রারম্ভের পূর্ব্বেই তাঁহার যশোরাশি দেশ-দেশান্তরে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। পিতার তৃতীয় পুত্র বলিয়া তিনি লোকের নিকট সেজরাজা নামে অভিহিত

হইতেন এবং তাঁহার কনিষ্ঠ নরনারায়ণকে লোকে ছোট রাজা বলিত।

এ দিকে জননী রাণী অম্বিকা পুত্র মাধবনারায়ণকে নানা সদ্গুণসম্পন্ন দেখিয়া ১৭৭৩ শকাব্দের (১২৫৭ সালের) বৈশাখ মাসে যশোহর জেলার মাগুরা গ্রাম-নিবাসী কোমল মুখ্য কুলীন কাশীনাথ বসু মহাশয়ের পরমা-সুন্দরী ও অশেষগুণবতী কামিনী নাম্নী কন্যার সহিত শুভ-বিবাহ সম্পাদন করিলেন। মাধব ও কামিনী-সম্মিলন আত্মীয়গণের পরম প্রীতিপদ হইল। মাধবনারায়ণও অভিমত ভার্য্যা-লাভে যারপরনাই সুখী হইলেন। রাণী অম্বিকা সপত্নীপুত্র প্রতাপশালী রাজেন্দ্রনারায়ণের কন্যা সারদাসুন্দরীকে বিবাহের উপযুক্তা দেখিয়া বাবুটিয়া-নিবাসী সহজ মুখ্য কুলীন কিঙ্কর-ঘোষের পুত্র কেদারনাথ ঘোষের সহিত তাঁহার পরিণয়কার্য্য সমাধা করিলেন। এই সকল বিবাহেও অন্নবস্ত্র বিতরণ এবং গান বাজনা ইত্যাদি আমোদ-প্রমোদের কোনটির ত্রুটি হয় নাই। রাণী অম্বিকা সপত্নী-পুত্র-বধূ ও সারদাকে নিজের পুত্রবধূ ও পৌত্রীর ন্যায় ভালবাসিতেন; কোনও পার্থক্য রাখিতেন না। তিনি সর্ব্বগুণালঙ্কৃত পুত্রবধূ ও জামাতা পাইয়া বড়ই আনন্দলাভ করিলেন।

এই সময় স্বার্থপর কর্ম্মচারিগণ প্রজাদিগের উপর এরূপ অত্যাচার আরম্ভ করিল যে, প্রজাগণ দলবদ্ধ হইয়া কর-প্রদান বন্ধ করিল। ঋণ-পরিশোধ করা দূরের কথা, কর্ম্মচারিগণ কতগুলি মোকদ্দমার সৃষ্টি করিয়া বসিল, নিরর্থক খরচ বৃদ্ধি হইল। উত্তমর্ণগণও ক্রমশঃ নালীশ ও ডিক্রী করিয়া সম্পত্তি নিলাম করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে ৺মহেন্দ্রনারায়ণের নিতান্ত আত্মীয় খানাকুল কৃষ্ণনগর-নিবাসী শ্রীযুক্ত দীননাথ বসু সর্ব্বাধিকারী মহাশয় মুনসেফী কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া নিজ বাটীতে পেন্‌সন্ ভোগ করিতেছিলেন। সাধু সুবিদ্বান্ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় ৺মহেন্দ্রনারায়ণের পত্নী ও পুত্রদ্বয়ের এতাদৃশ বিপদের

কথা শুনিয়া রায়েরকাঠী রাজ-বাটীতে আগমন করিলেন এবং রাণী অম্বিকার সহিত পরামর্শ করিয়া ম্যানেজার-রূপে এষ্টেটের সমুদয় কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। সর্ব্বাধিকারিমহাশয়ের সুদক্ষতায় এষ্টেটের কার্য্যকর্ম্ম পুনরায় সুশৃঙ্খলভাবে চলিতে লাগিল। প্রজাগণও রীতিমত করপ্রদান করিতে আরম্ভ করিল। সংসারের খরচ চলিয়া গিয়া ঋণও কিছু কিছু পরিশোধ হইতে লাগিল।

এই সময়ে রাণী অম্বিকা তাঁহার তেলিখালি নামক তালুকে শ্রীশ্রীকালী মাতার বাটীর সন্নিকটে একটী দীর্ঘিকা খনন করাইয়া উৎসর্গ করেন।* এই উৎসর্গ উপলক্ষে তাঁহার পুত্রবধূ এবং পুত্রগণ ও অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ তাঁহার সঙ্গে তথায় গমন করিয়াছিলেন। সেখানে প্রতিষ্ঠা-উপলক্ষে তিনি প্রজাগণ ও তাহাদের রমণীগণকে পূর্ণপরিতোষে ভোজন করাইয়াছিলেন। আসিবার সময় পথে নব পুত্রবধূ উৎকট হিষ্টিরিয়া পীড়ায় আক্রান্ত হ'ন, তাহাতে কোন চিকিৎসায় তাঁহার রোগ ভাল হইল না। পরিশেষে তারপাশা-নিবাসী তারাচাঁদ চট্টোপাধ্যায় নামক এক ব্যক্তি দৈব ঔষধে তাঁহার আরোগ্য করেন। রাণী অম্বিকা তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে শতাধিক টাকা পারি-

---

* এই শ্রীশ্রীকালী বিগ্রহ তাঁহার দাদা শ্বশুর ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ প্রাণনারায়ণ প্রতিষ্ঠিত করেন এবং সেবার-জন্য করিকড়া-নিবাসী জনৈক বৈদিক ব্রাহ্মণকে ২৪ বিঘা ব্রহ্মোত্তর ও ১০০ বিঘা দেবোত্তর জমী দান করেন। এতদ্ব্যতীত মন্দিরের কার্য্যাদি করিবার ও দেবতার সেবার নিমিত্ত পুষ্প, বিল্বপত্রাদি যোগাইবার জন্য জনৈক পরামাণিককে ১২ বিঘা এবং মন্দির ও প্রাঙ্গণাদি পরিষ্কার করণের জন্য জনৈক ভুঞমালীকে ১২ বিঘা জমি নিষ্কর দান করেন। ঐ প্রস্তর-নির্ম্মিত শ্রীশ্রীকালীমাতা এখনও বর্ত্তমান আছেন এবং ঐ ব্রাহ্মণ সেবাইত ও পরিচারকগণের বংশধরেরা শ্রীশ্রীকালীমাতার পূজা-অর্চ্চনাদি ও মন্দির-সংক্রান্ত অন্যান্য কার্য্যাদি সম্পাদনপূর্ব্বক ঐ সমস্ত জমী ভোগ করিতেছেন। দুঃখের বিষয়, এই সকল জমির কিয়দংশ নদীতে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

তোষিক প্রদান করেন এবং প্রতি বৎসর দুইটী টাকা করিয়া পাইবার ব্যবস্থা করিয়া দেন। তাঁহার বংশধরগণ এখনও ঐ বার্ষিকের টাকা মাধবনারায়ণের পুত্র গিরীন্দ্রনারায়ণ ও নগেন্দ্রনারায়ণ প্রভৃতির নিকটে পাইতেছেন।

মাধবনারায়ণ পিতৃপিণ্ডদানহেতু গয়াক্ষেত্রে গমন করিবার জন্য জননীর অনুমতি চাহিলেন। রাণী অম্বিকা পুত্রের এতাদৃশ পিতৃভক্তি-দর্শনে একান্ত প্রীত হইয়া পুত্রকে গয়াক্ষেত্রে পাঠাইবার উদ্যোগ করিলেন। তখন রেলের পথ ছিল না, নৌকাই তীর্থাদি গমনাগমনের সুগম পন্থা ছিল। পথে চোর-ডাকাত ও ঝড়-তুফানের ভয় ছিল এবং অনেক বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইত। সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের উপদেশমত রাণী অম্বিকা অনেক লোক জন ও বড় বজরা এবং ছোট ছোট কয়েকখানি নৌকা সঙ্গে দিয়া পুত্রকে গয়াক্ষেত্রে প্রেরণ করিলেন। মাধবনারায়ণ গয়াক্ষেত্রে গমন করিয়া পিতৃপিণ্ডদান এবং ষোড়শাদি পার্ব্বণ শ্রাদ্ধও সমাপন করিলেন। পরে মাতার আদেশ অনুযায়ী গয়াস্থ ৩৫০ ঘর গয়ালীর প্রত্যেককে এক একটি টাকা প্রণামী ও এক একখান পিত্তলের থালা ক্ষীরের পৌঁড়া সহ দান করিলেন। তিনি নিজ গয়ালাকে এক বিঘা জমী ও বাৎসরিক ৪৲ টাকা দিবারও ব্যবস্থা করেন।* সুফল ইত্যাদির দরুণ মাধবনারায়ণ গয়ালী (গয়ার পুরোহিত) বুল্লুকলাল পাঠকমহাশয়কে ৫০০৲ টাকা প্রণামী দিয়াছিলেন। গয়াক্ষেত্র হইতে আসিবার সময়ে তিনি একটী সুশিক্ষিত সুন্দর ঘোটক‡ ও একজন ঘোড়ার সহিস সঙ্গে আনিয়াছিলেন। বাটী আসিয়া তিনি মাতা ও ভগিনীর চরণে প্রণিপাত করিলেন। মাতা পুত্রকে নিরাপদে বাটীতে প্রত্যাগত দেখিয়া আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইলেন।

* এই জমীর খাজনা ও বার্ষিকের টাকা মাধবনারায়ণের গয়ালী বুল্লুকলাল পাঠকের ওয়ারিস মোহনলাল পাঠককে অদ্যপর্য্যন্ত মাধবনারায়ণের পুত্রগণ শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনারায়ণ, নগেন্দ্রনারায়ণ প্রভৃতি দিতেছেন।

‡ এই সুন্দর সুশিক্ষিত ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ঘোড়াটী সিঁড়ি বাহিয়া দ্বিতলে উঠিতে পারিত।

সর্ব্বাধিকারী মহাশয় কর্ত্তৃক সুশৃঙ্খলভাবে এষ্টেটের কার্য্য পরিদর্শনের ফলে কর্ম্মচারিগণের অসদুপায়ে অর্থ উপার্জ্জনের পথ রুদ্ধ হইল। তাহাতে তাঁহারা আর ম্যানেজার মহাশয়ের চোখে ধূলি দিয়া সর্ব্বগ্রাস করিতে সমর্থ হইলেন না ; সুতরাং তাঁহারা সকলে মিলিয়া সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের বিরুদ্ধে নানারূপ ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। সর্ব্বাধিকারী মহাশয় ইহাতে বিপদের আশঙ্কা উপলব্ধি করিয়া নিতান্ত বিরক্ত হইলেন এবং স্বদেশে চলিয়া গেলেন। বৈষয়িক কার্য্যকর্ম্ম আবার সেই দুষ্ট কর্ম্মচারিগণের হস্তে আসিল ; ফলে মহেন্দ্রনারায়ণের এষ্টেটের বিশৃঙ্খলতা আবার পূর্ণ মাত্রায় প্রকটিত হইল।

নড়াইলের জমীদার হরনাথ রায় মহাশয়ের নিকট ৺মহেন্দ্রনারায়ণের অনেক টাকা ঋণ ছিল। রায়মহাশয় এক্ষণে মহেন্দ্রনারায়ণের এষ্টেটে এতাদৃশ গোলযোগের বিষয় অবগত হইয়া তাঁহার প্রাপ্য টাকার জন্য আদালতে নালিশ করিলেন। মাধবনারায়ণ তখন নাবালক হইলেও অসাধারণ বুদ্ধিমান্ ছিলেন এবং তাঁহার বুদ্ধিশক্তির প্রখরতা ক্রমেই প্রস্ফুটিত হইতেছিল। তিনি এই নালিশের বিষয় অবগত হইয়া জননীর অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক নড়াইলে যাইলেন এবং হরনাথবাবু ও খ্যাতনামা রামরতনবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। উভয়েই তাঁহাকে মহাসমাদরে গ্রহণ করিলেন। রামরতনবাবু মাধবনারায়ণের নিকট সমুদয় বিবরণ শুনিয়া হরনাথবাবুকে বলিলেন, "বড় বিপদে পড়িয়া আজ সেজ রাজা আমাদের এখানে উপস্থিত হইয়াছেন ; তুমি এখন ইঁহার স্বর্গগত পিতার উত্তমর্ণ। যাঁহাকে আমরা

* দীননাথ বসু সর্ব্বাধিকারী শ্রীনাথ সর্ব্বাধিকারীর বংশধর। শ্রীনাথ সর্ব্বাধিকারী মাধবনারায়ণের পিতামহ প্রাণনারায়ণের জামাতা। প্রাণনারায়ণ এই জামাতাকেও প্রভূত বিষয় সম্পত্তি দিয়াছিলেন। এখনও তাঁহার বংশধরগণ উহা ভোগ করিতেছেন।

কোনও দিন পরম যত্নেও এখানে আনিতে পারি নাই, আজ তিনি স্বয়ং বিনা নিমন্ত্রণে আমাদের গৃহে অতিথি। ইনি প্রধান ভূঞিয়া কিঙ্কর রায়ের বংশধর রাজা রুদ্রনারায়ণের সাক্ষাৎ সপিণ্ডাধিকারী। ইঁহারা আমাদের দক্ষিণ রাঢ়ীয়-সমাজের শ্রেষ্ঠ গোষ্ঠীপতি মৌলিক। ইঁহার পিতা ৺মহেন্দ্র-নারায়ণের দানশীলতা চিরপ্রসিদ্ধ ছিল। ইঁহারা আমাদের অপেক্ষা অনেক প্রাচীন জমীদার। এমন কি, ইঁহারা চন্দ্রদ্বীপ ও যশোহরের রাজগণ অপেক্ষাও প্রাচীন। ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ অনেক ব্রাহ্মণকে অনেক ব্রহ্মোত্তর এবং কায়স্থ ও অন্যান্য শ্রেণীর লোকদিগকে অনেক নিষ্কর ভূমি দান করিয়াছেন। এমন কি, মুসলমান ফকির ও গরীবদিগকেও বিস্তর নিষ্কর "চেরাকি" (চেরাকনামীয় দান) দান করিয়াছেন। ইঁহার পিতা মহাত্মা মহেন্দ্রনারায়ণ এক সময়ে আমাদের ও শোভাবাজারের রাজা রাধাকান্ত দেবের বিশেষ সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন। ইঁহার পিতা আমাদিগকে সাহায্য না করিলে আমাদের উভয়কেই বিশেষ অপদস্থ হইতে হইত। কলিকাতানিবাসী বাবু আশুতোষ দেব (সাতুবাবু) যখন "একজাই" করিতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন, তখন কলিকাতা শোভাবাজার-নিবাসী রাজা রাধাকান্ত দেব ও আমি আশুতোষবাবুর বিরোধী হইয়াছিলাম। কিন্তু আমরা এবং আমাদের আত্মীয়স্বজন বড় বড় কুলীনগণ পরামর্শ করিয়া দেখিলাম যে, আমাদের দ্বারা সাতুবাবুর একজাই বন্ধ করা সম্ভব হইবে না। ইহা বুঝিয়া আমরা ম্রিয়মাণ হইলাম। তখন হঠাৎ আমাদের পক্ষীয় একজন প্রাচীন কুলীন কায়স্থ বলিলেন, 'রায়ের-কাঠীর খ্যাতনামা মহেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী কালাঘাটে আছেন। এ সমাজের অনেক শ্রেষ্ঠ কুলীন তাঁহার আশ্রিত, বাধ্য ও বৃত্তিভোগী, তাঁহাকে আমাদের দলভুক্ত করিতে পারিলে নিশ্চয়ই "একজাই" বন্ধ হইবে, নচেৎ কিছুতেই বন্ধ করিতে পারিবেন না।' ইহা শুনিয়া রাজা রাধাকান্ত

দেব বাহাদুর তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার মহেন্দ্রনারায়ণ দেববাহাদুরকে আমার সঙ্গে মহেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরীর নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহাকে আমরা আমাদের সভায় সভাপতি হইবার প্রস্তাব এবং মনোমত অভিপ্রায় ব্যক্ত করি। প্রথমে তিনি অমত প্রকাশ করিলেন, তৎপরে আমাদের বিশেষ অনুরোধে স্বীকৃত হইলেন। "একজাই" একটি বিশেষ সম্মানের কার্য্য, তজ্জন্যই একের সেই সম্মান-লাভে অন্যে প্রতিবন্ধক হইত। আমরা মহেন্দ্রনারায়ণকে এইরূপে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইয়া অসিবার পরেই এই ঘটনা সর্ব্বত্র প্রচার হইল। আশুতোষ দেব বড়ই চিন্তিত হইলেন এবং তাঁহার পুত্র গিরীশ বাবুকে মহেন্দ্রনারায়ণের নিকট সাহায্য পাইবার জন্য পাঠাইলেন, এবং বলিয়া দিলেন,— মহেন্দ্রনারায়ণ সহজে স্বীকৃত না হইলে তুমি তাঁহার নিকটে তাঁহার সমুদয় ঋণ বিনা সুদে ও সহজ কিস্তি-বন্দীতে শোধ লইবার প্রস্তাব করিবে। গিরীশবাবু মহেন্দ্রনারায়ণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পিতার কথানুযায়ী সমুদয় চেষ্টাই করিলেন। তাহাতে মহেন্দ্র-নারায়ণ বলিলেন, টাকার লোভে আমি কখনই প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ করিতে পারিব না। আপনি পূর্ব্বে আসিলে আমি তাঁহাদের পক্ষে যাইতাম না এবং আপ-নাকে এরূপে ঋণ-পরিশোধের প্রস্তাবও করিতে হইত না। আমি টাকার কাঙ্গাল নই। ইহা শুনিয়া গিরিশবাবু বড়ই দুঃখিত হইয়া ফিরিয়া আসিলেন এবং পিতাকে সমুদয় জানাইলেন। এদিকে রাজা রাধাকান্ত দেব এ বিষয় অবগত হইয়া মহেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরীকে লইয়া আসিবার জন্য পুনরায় তাঁহার মধ্যম পুত্র কুমার রাজেন্দ্রনারায়ণ দেব বাহাদুরকে* কালীঘাটে পাঠাইলেন।

মহেন্দ্রনারায়ণ শোভাবাজারে রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের বাটীতে আসিলেন এবং সকলের ইচ্ছানুসারে সভার সভাপতি-পদ গ্রহণ করিলেন। অনেক তর্ক-বিতর্কের পর সর্ব্বসম্মতিক্রমে "একজাই" বন্ধ করা স্থির

---

* রাজেন্দ্রনারায়ণ দেব বাহাদুর পরে রাজা উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন।

হইল। অপর পক্ষে সাতুবাবুও দক্ষিণ রাঢ়ীয় সমুদয় সমাজের কুলীন-দিগকে তাঁহার "একজাই"তে যোগ দিবার জন্য অজস্র টাকা ব্যয় করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু ফল হইল না। কতিপয় কুলীন লইয়াছিলেন বটে; কিন্তু সকল সমাজের সব শ্রেণীর কুলীন একত্রীভূত করিতে পারিলেন না; সুতরাং তাঁহার "একজাই" ও সম্পূর্ণ হইল না। সেই মহাত্মা মহেন্দ্রনারায়ণের পুত্র মাধবনারায়ণ আজ আমাদের এখানে আসিয়াছেন; তাঁহার কিরূপ উপকার করিলে সেই কৃতজ্ঞতা পরিশোধ করিতে পারি, তাহা আমি বিবেচনা করিতে পারিতেছি না।" অতঃপর হরনাথবাবু বলিলেন, 'আমি আমার পাওনা কিস্তিবন্দী করিয়া লইতে সম্মত আছি এবং সমস্ত টাকা পরিশোধের সময়ে আমি কিছু টাকা রেহাই দিতেও সম্মত আছি; কিন্তু আমাকে কতক টাকা নগদ দিতে হইবে। বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি, ইঁহাদের এষ্টেটে বড়ই বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হইয়াছে। যাহা হউক, ইঁহার মাতা চৌধুরাণীর মত করিয়া এষ্টেটের ভার যদি আমার উপর অর্পণ করেন, তবে আমি ইহাদের সমুদয় ঋণ পরিশোধ করিয়া দিয়া ইঁহাদের এষ্টেট হইতেই আমার পাওনা টাকা আদায় করিয়া লইব এবং এষ্টেটের যাহাতে উন্নতি ও সুশৃঙ্খলতা হয়, তাহার বিশেষ চেষ্টা করিব ও ইঁহাদের ভরণপোষণ ও বার্ষিক, দেবার্চ্চনা, ক্রিয়া-কর্ম্মের জন্যও পৃথক বন্দোবস্ত করিয়া দিব।

রতনবাবু ও হরনাথবাবু মাধবনারায়ণকে যথেষ্ট আদর আপ্যায়ন করিলেন এবং মাধবনারায়ণের অতুলনীয় সৌন্দর্য্যে ও মিষ্টালাপে তাঁহার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইয়া এষ্টেট রক্ষার নিমিত্ত কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাঁহারা বলিলেন, আপনি বাটী যাইয়া আপনার মাতার ইহাতে মত করাইতে বিলম্ব করিবেন না। বিলম্বে এষ্টেট রক্ষা করা দুর্ঘট হইবে। মাধবনারায়ণ বাটীতে আসিয়া মাতা, ভ্রাতা ও ভগিনীকে সমুদয় বিবরণ বলিলেন।

ভগিনী হরসুন্দরী বিধবা হইয়া পিতৃগৃহে বাস করিতেছিলেন। হরসুন্দরী মাধবনারায়ণ ও নরনারায়ণের অপেক্ষা বয়সে অনেক বড় ছিলেন। মাধব-নারায়ণের নিকট সকল বিবরণ অবগত হইয়া তাঁহারা প্রথমতঃ বড়ই আনন্দিত হইলেন এবং নড়াইল-নিবাসী খ্যাতনামা জমীদার হরনাথ রায় মহাশয়ের প্রতি সম্পত্তির ভার ন্যস্ত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

স্বার্থপর দুষ্ট কর্ম্মচারিগণ যখন দেখিলেন যে, তাহাদের সমস্ত ষড়যন্ত্র পণ্ড হয়, তখন তাঁহারা অম্বিকা চৌধুরাণী ও হরসুন্দরীকে বুঝাইলেন যে, 'হরনাথবাবু লোভী জমীদার, তাঁহার প্রতি সম্পত্তির ভারার্পণ করিলে সকল সম্পত্তিই তিনি আত্মসাৎ করিবেন; আপনারা আর কিছুই ফিরিয়া পাইবেন না; পুত্রদ্বয়কে পথে দাঁড় করাইবেন। আমরা বিশেষ চেষ্টা করিলে দেনা পরিশোধ করিয়া সমুদয় সম্পত্তি রক্ষা করিতে পারিব।' অম্বিকা চৌধুরাণীর চিত্ত ইহাতে দোদুল্যমান বুঝিয়া কর্ম্মচারিগণ গোপনে হরসুন্দরীকে বুঝাইতে আরম্ভ করিলেন। হরসুন্দরী চতুরা বুদ্ধিমতী হইলেও দুষ্ট কর্ম্মচারীদিগের কুটিলতা বুঝিতে পারিলেন না। প্রথমতঃ তিনি কর্ম্মচারীদিগের প্রস্তাবে অসম্মতা হইলেন বটে; তৎপরে দুষ্ট কর্ম্মচারীগণ অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন,—'আমাদের কয়েক পুরুষ এই অন্নে প্রতিপালিত, অদ্য হাতে ধরিয়া সমুদয় সম্পত্তি পরকে দেওয়া হইতেছে, ইহা কি প্রকারে সহ্য করিব? বিশেষতঃ তিনি পাওনাদার ও লোভী জমীদার। আপনার ভ্রাতারা নিরন্ন হইবেন, ইহা ভাবিয়াই আমরা আকুল।' হরসুন্দরী তাঁহাদের অশ্রুবর্ষণে বিচলিতা হইয়া তাঁহাদের কুটিল জালে নিপতিতা হইলেন। যখন তাঁহার মত পরিবর্ত্তন হইল, তখন মাতা চৌধুরাণীর মত পরিবর্ত্তন করিতে তাঁহাদের আর কোনই কষ্ট পাইতে হইল না। হরনাথবাবুর প্রতি এষ্টেটের ভার অর্পণ করিবার সঙ্কল্প রহিত হইল। এদিকে পূর্ব্ব প্রস্তাবানুসারে এষ্টেটের

কাগজপত্র বুঝিয়া লইবার নিমিত্ত একজন উপযুক্ত কর্ম্মচারী হরনাথবাবু পাঠাইলেন। কর্ম্মচারী রায়েরকাঠীতে উপস্থিত হইলে মাধবনারায়ণ মাতা ও ভগিনীকে বিশেষ করিয়া বুঝাইলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। কর্ম্মচারী নড়াইলে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া রামরতনবাবু ও হরনাথবাবুকে সকল বিষয় জানাইলেন। রামরতনবাবু শুনিয়া বড়ই দুঃখিত হইলেন এবং একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, 'যাহা ঘটিবে, তাহা কেঅন্যথা করিবে?' হরনাথবাবু পূর্ব্বেই তাঁহার পাওনা টাকার নালিশ করিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে সেই টাকার ডিক্রী হইল। নগদ টাকা দিয়া যে কিস্তিবন্দী করার কথা হইয়াছিল তাহাও তাঁহাকে দেওয়া হইল না। ক্রমে সেই ডিক্রীতে তেলিখালি, সেলিমাবাদ প্রভৃতি পরগণার সওয়া দশ গণ্ডা জমিদারীর অংশ, ১৮॥ গণ্ডা জমীদারী ও তাহার অধীন জোলাগাতী প্রভৃতি অনেক উৎকৃষ্ট মূল্যবান্ সম্পত্তি নিলাম হইল।

ঢাকা-নিবাসী নবাব গণি মিঞা সাহেব * তাহা ক্রয় করিলেন। ইহার অল্প দিন পরেই অন্যান্য দেনাতেও রামচন্দ্রপুর, পত্তাশী, শিয়ালকাঠী, ছাগলকান্দা, শশীদ প্রভৃতি অনেক সম্পত্তি নিলাম হইতে লাগিল। বসতি-বাটী পর্য্যন্ত নিলাম হইল। কর্ম্মচারিগণ ডিক্রিতে জমা দিবার জন্য যে টাকা অম্বিকা চৌধুরাণীর নিকট হইতে লইয়া যাইতেন তাহা তাঁহারা জমা না দিয়া পরস্পরে ভাগ করিয়া লইতেন। এমন কি, ঘুষ লইয়া অপর পক্ষকে ঐ সকল সম্পত্তি ক্রয় করাইয়া দিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। এই সময়ে মাতা অম্বিকা চৌধুরাণী নিজের অর্থে কতিপয় ভূসম্পত্তি ও বসতি-বাটী অন্য নামে ক্রয় করিয়া রাখিলেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার নিজেরও কিছু সম্পত্তি ছিল। সুবুদ্ধি ও বিদ্বান্ মাধবনারায়ণ অল্পবয়স্ক হইলেও

* এই সম্পত্তিগুলি যখন গণি মিঞা সাহেব ক্রয় করেন, তখন তিনি নবাব উপাধি লাভ করেন নাই। পরে তিনি নবাব উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন।

কর্ম্মচারীদিগের বিশ্বাসঘাতকতা সমস্ত বুঝিলেন; কিন্তু জননী ও ভগিনীর কর্ম্মচারীদিগের উপর এমনই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তাঁহার কথায় কিছুই কার্য্য হইত না। এক্ষণে বিষয় নীলাম হইয়া যাওয়ায় রাণী অম্বিকা কর্ম্মচারীদিগের ধূর্ত্ততা বুঝিতে পারিলেন এবং তাহাদের উপর নিতান্ত বিরক্ত হইলেন। এদিকে মাধবনারায়ণও সাবালক হইলেন। রাণী অম্বিকা পুত্রকে কার্য্যক্ষম বুঝিয়া তাঁহার উপরই সমুদয় কার্য্যভার অর্পণ করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

মাধবনারায়ণ অল্পবয়স্ক হইলেও জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিচারে প্রবীণ ছিলেন। সম্পত্তি পর্য্যবেক্ষণ করিতে আরম্ভ করিয়া তিনি স্বল্পকাল মধ্যে উহাতে সুশৃঙ্খলতা আনয়ন করিলেন। রীতিমত কিস্তিতে কিস্তিতে কর আদায় হইতে লাগিল। উত্তমর্ণগণও সেজ রাজার সঙ্গে কিস্তিবন্দীমত তাঁহাদের প্রাপ্য টাকা পাইতে লাগিলেন। বড় হিস্সা হইতে আবার অভাব ও বিশৃঙ্খলা চলিয়া গেল। গৃহ শান্তি ও লক্ষ্মীর আবাসভূমি হইল। রাণী অম্বিকা পুত্রের অসাধারণ ক্ষমতা-দর্শনে পরম প্রীতা হইয়া নিশ্চিন্তচিত্তে চন্দ্রনাথ, শ্রীক্ষেত্র প্রভৃতি তীর্থ-পরিভ্রমণে বহির্গত হইলেন।

মাধবনারায়ণের বিদ্যাভ্যাস ও জ্ঞান-লাভ আজকালকার শিক্ষিতদের ন্যায় আত্মসুখ-সম্ভোগে পর্য্যবসিত হইত না। প্রকৃত জ্ঞানবানের ন্যায়, তিনি যেমন নিজেদের এষ্টেটের শাসন ও সংরক্ষণে নিবিষ্টচিত্ত ছিলেন, সেইরূপ কিরূপে গ্রামের প্রকৃত উন্নতি ও লোকসাধারণের উপকার হয় তাহা সর্ব্বদা চিন্তা করিতেন। রায়েরকাঠী গ্রামটি চতুর্দ্দিকে নদীবেষ্টিত এবং পথঘাটশূন্য ছিল। তিনি রাজবাটী হইতে দক্ষিণ দিকে দামোদর নদ পর্য্যন্ত প্রায় দেড় ক্রোশব্যাপী একটি প্রশস্ত পাকা রাস্তা নির্ম্মাণ করাইয়া পথের দুই পার্শ্বে ঝাউ প্রভৃতি ছায়াতরু রোপণ করাইয়া দিলেন এবং ঐ রাস্তা হইতে আর একটী পাকা রাস্তা ৺কালীমাতার বাটী পর্য্যন্ত তৈয়ারী করাইলেন। পূর্ব্ব দিকেও একটী পাকা রাস্তা মদনমোহন সরকারের বাটী পর্য্যন্ত নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। রাস্তা-নির্ম্মাণ-উপলক্ষে জ্ঞাতিদিগের সঙ্গে মামলা-মোকদ্দমায় তাঁহার প্রচুর অর্থব্যয় হইয়াছিল। কিন্তু দেশের উহাতে পরম উপকার হইবে বলিয়া তিনি ঋণগ্রস্ত হইয়াও এবং জ্ঞাতি-বিরোধ সত্ত্বেও রাস্তা-নির্ম্মাণে পরাঙ্মুখ হইলেন না।

ইহার কিছুকাল পরে রাণী অম্বিকা চৌধুরাণী তীর্থ-পর্য্যটনান্তে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। দেশহিতকর কার্য্যে কৈশোরেই পুত্রের এতাদৃশ অনুরাগ ও দক্ষতা দেখিয়া মাতা অম্বিকা তাঁহার নিজের মূল্যবান্ অলঙ্কার মধ্যে একখানি অলঙ্কার মাধবনারায়ণকে প্রদান করিয়া পাকা রাস্তার মধ্যে যে তিনটি কাষ্ঠের পুল ছিল তাহার প্রথমটির উপরে একটি পাকা সেতু নির্ম্মাণ করিয়া দিতে অনুমতি করিলেন। পুত্র মাতার আশীর্ব্বাদস্বরূপ অলঙ্কারখানি গ্রহণ করিয়া উহার মূল্যে একটী সুপ্রশস্ত পাকা সেতু ও ঐ সেতুর নিম্নে খালের উভয় পার্শ্বে দুইটী কক্ষ নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন। বিদেশীয় লোকসাধারণ রায়েরকাঠীতে আসিলে প্রোক্ত কক্ষের একটীতে রন্ধনকার্য্য ও অপরটীতে শয়ন করিতে পারিতেন। উহাতে অতিথি-অভ্যাগতের যে কি উপকার হইয়াছিল তাহা বর্ণনাতীত।* মাতার এই সদনুষ্ঠান দেখিয়া ভগিনী হরসুন্দরী ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃজায়া শিবশঙ্করী যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় সেতু দুইটী পাকা করিয়া দিয়া উৎসর্গ করেন। এক্ষণে রাজবাটী হইতে তিন মাইল পর্য্যন্ত দামোদর-তীরে যাতায়াতের পথ নিতান্ত সুগম হওয়ায় গ্রামের যে কি মহৎ উপকার হইল তাহা কিশোর মাধবনারায়ণের প্রতিপক্ষের প্রৌঢ়গণও উপলব্ধি করিয়া লজ্জিত হইলেন।

সেকাল ও একালের বিষয়পরিচালনের মধ্যে বিষম বৈলক্ষণ্য পরিলক্ষিত হইবে। তখন প্রজাদের কি ফৌজদারী, কি দেওয়ানী সমুদয় অভিযোগেরই জমীদার-সরকারে বিচার হইত। প্রজাগণ নিজ নিজ জমীদারকে পিতার ন্যায় শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিত এবং তাহাদের রক্ষক বলিয়া জানিত। জমীদারগণও প্রজাগণকে অপত্যনির্ব্বিশেষে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। প্রজার গৃহে কোনও দ্রব্য জন্মিলে বা আনিলে উহার অগ্রভাগ তাহারা নিজ নিজ

*এই রাস্তাটি এক্ষণে জেলাবোর্ডের অধীন হইলেও সেতু কয়েকটী এখনও বর্ত্তমান আছে।

জমীদারকে না দিয়া নিজেদের ভোগে লাগাইত না। জমীদারগণও প্রজাদিগের বিপদ নিজেদের বিপদ জ্ঞান করিয়া উহার প্রতিকারে প্রাণপণে প্রবৃত্ত হইতেন। প্রজাদের অন্নকষ্ট উপস্থিত হইলে নিজেদের জিনিষপত্র বন্ধক দিয়া, এমন কি উত্তমর্ণকে খত দিয়াও তাহাদের জন্য ধান্যাদি ক্রয় করিয়া তাহাদের অন্নকষ্ট নিবারণ করিতেন। প্রজাদের স্ত্রী-কন্যাগণ জমীদারদিগের কন্যার ন্যায় স্নেহ ও আদর পাইত; তাহারাও জমীদারদিগকে পিতার ন্যায় শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিত। প্রজা ও জমীদারের মধ্যে সেই অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ কিরূপে বর্ত্তমানে একেবারে লোপ পাইয়াছে ও কিরূপে সেই শ্রদ্ধা, ভক্তি ও স্নেহের বন্ধন ছিন্ন হইয়া গিয়াছে তাহা কি কেহ একবারও ভাবিয়া দেখিয়াছেন? এক্ষণে প্রজাগণ জমীদারগণকে কিরূপে বিপদাপন্ন করিবে, এমন কি গোপনে খুন করিবে, তাহার জন্য কেন চেষ্টিত হয় এবং জমীদারগণও কিরূপে প্রজাদের উদ্বাস্ত করিয়া নূতন প্রজা-পত্তনে বিশিষ্টরূপে লাভবান্ হইবেন এইরূপ অহর্নিশ কল্পনায় জল্পনায় ব্যাপৃত থাকেন, তাহা কি কেহ একবারও চিন্তা করেন? বাঙ্গালার প্রাণ জমীদার ও প্রজাবর্গের এই প্রবল দ্বন্দ্বে সোণার বাঙ্গালা ক্রমে ছারখার হইয়া যাইতেছে, তাহা কি কেহ লক্ষ্য করিতেছেন? বস্তুতঃ জমীদার ও প্রজাবর্গের মধ্যে পূর্ব্বের ন্যায় পুনরায় প্রীতবন্ধন প্রতিষ্ঠিত না হইলে বাঙ্গালার ভাগ্য-পরিবর্ত্তনের আর কোনই আশা নাই। প্রকৃত পক্ষে পরস্পরের যে পরস্পরের সাহায্য ব্যতীত অস্তিত্ব নাই উহা কেহই বুঝেন না; বুঝিবার চেষ্টাও করেন না। ফলে জমীদার ও প্রজা উভয়ে ক্রমে সর্ব্বস্বান্ত হইতেছেন। প্রজাগণ খাজনার একটি টাকাও সহজে দিবে না; ঐ এক টাকার জন্য আদালতে এক শত টাকা ব্যয়েও কুণ্ঠিত হয় না। এদিকে জমীদার-

গণেরও এক টাকা পাওনা স্থানে দশ টাকা দাবি করিয়া মিথ্যা নালীশ রুজু করিতে একটুও বিবেকে বাধে না। বৎসরান্তে চৈত্রমাসের শেষ দিন জেলা ও মহকুমার আদালতগুলি অনুসন্ধান করিলেই ইহার যথার্থতা উপলব্ধি হইবে। কি আশ্চর্য্য! ভিন্নদেশীয় লোকের সঙ্গে লোকের যেরূপ সৌহার্দ্দ থাকে, একদেশে একগ্রামে থাকিয়াও প্রজা ও জমীদারে তাহার শতাংশও নাই। জমীদার পীড়ার প্রকোপে জীবনান্ত হইতে বসিলেও প্রজাগণ একবার ডাকিয়াও জিজ্ঞাসা করে না। আবার প্রজারা দুর্ভিক্ষে প্রপীড়ত হইলেও জমীদার উহাতে নিতান্ত উদাসীন। উহার ফলে পূর্ব্বকার অন্নাভাব-পরিশূন্যা শান্তিময়ী স্বাস্থ্যময়ী বঙ্গভূমিতে বার মাস দুর্ভিক্ষ, অশান্তি ও পীড়া লাগিয়াই রহিয়াছে। প্রজা ও জমীদারের পরস্পরের অনুরাগাভাবে গ্রাম্য খালগুলি ভরাট হইয়া জল-চলাচলের ব্যাঘাত ঘটাইতেছে; ফলে ম্যালেরিয়া আমাদের নিত্যসঙ্গী হইয়া পড়িয়াছে। প্রায় সর্ব্বত্র জঙ্গল ও আবর্জ্জনাপূর্ণ। গ্রামের পুরাতন পুষ্করিণীগুলি সংস্কারাভাবে পঙ্কিল ও শুষ্কপ্রায়। গো, ছাগ প্রভৃতি গৃহপালিত পশুগুলি চরিবার স্থানাভাবে অস্থিচর্ম্ম-সার হইয়া নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর জীবন বহন করিতে করিতে অকালে কালকবলে নিপতিত হইতেছে। পল্লীগ্রামের অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে। গ্রামের বর্দ্ধিষ্ণু ব্যক্তিরা সহরে আসিয়া কোন মতে বাস করিতেছেন এবং গরীব বাসিন্দারা গ্রামে থাকিয়া ম্যালেরিয়ায় ক্রমশঃ কবলিত হইতেছেন। জমীদার ও প্রজার মধ্যে অনৈক্যে দেশের ঘোর সর্ব্বনাশ ঘটিতেছে।

মাধবনারায়ণ ক্রমশঃ দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিয়া দেশমধ্যে প্রতিষ্ঠাবান্ হইয়া উঠিলেন। দেশে দস্যুতস্করের উপদ্রব কমাইলেন। কুলমহিলাদের সম্ভ্রম-রক্ষার পক্ষেও

তিনি বিশেষ যত্নবান্ ছিলেন। মাধবনারায়ণ এমনি প্রতাপবান্ হইলেন যে, তাঁহার ভয়ে দুষ্ট বদমাইস চোর ডাকাত গ্রাম ত্যাগ করিতে লাগিল। প্রজাদিগের মধ্যে কোনও বিবাদ-বিসম্বাদ উপস্থিত হইলে উহার বিচার-মীমাংসা তিনিই করিতেন। তাঁহার কোন প্রজাই ফৌজদারী কিংবা দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমা করিতে যাইত না। ক্রমে বিচারকার্য্যে তাঁহার এরূপ সুনাম প্রচারিত হইল যে, অন্যান্য সরিকদিগের এবং বিভিন্ন জমিদারের প্রজাগণও পরস্পর বিবাদ স্থলে সেজ-রাজার নিকট বিচারপ্রার্থী হইত। তিনি ও নিজ প্রজা-নির্ব্বিশেষে উক্ত প্রজাদের বিবাদ মীমাংসা করিয়া দিতেন।

মাধবনারায়ণ বিষয়-কর্ম্মে নিরত থাকিলেও তাঁহার বিদ্যানুরাগ সর্ব্বদা তাঁহাকে জ্ঞানীদিগের সংসর্গ হইতে দূরে থাকিতে দিত না। প্রত্যহ সন্ধ্যার পর সংস্কৃতশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত এবং পারস্য ও আরব্যভাষাবিৎ মৌলবীদিগের সঙ্গে শাস্ত্রালোচনায় কালাতি-পাত করিতেন। সেইজন্য দেশ-বিদেশ হইতে সংস্কৃতশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত এবং আরব্য ও পারস্য ভাষাভিজ্ঞ মৌলবীগণ মাধবনারায়ণের সভায় উপস্থিত হইতে আরম্ভ করিলেন। সেজরাজাও সন্ধ্যার পর তাঁহাদের সঙ্গে শাস্ত্রানুশীলনে কালযাপন করিয়া প্রত্যেককে তাঁহার বিদ্যানুরূপ পুরস্কারদানে পরিতুষ্ট করিয়া বিদায় দিতেন। কোটালীপাড়া-নিবাসী প্রধান বৈয়াকরণ বিশ্বেশ্বর তর্কপঞ্চানন, কেওড়া-নিবাসী দুর্গাচরণ সেন কবীন্দ্র এবং ঝশিরকাঠী-নিবাসী খ্যাতনামা বৃন্দাবন সেন কবিরত্ন সেজরাজার সভাপণ্ডিত ছিলেন।* সঙ্গীতানুশীলনও

---

* বিশ্বেশ্বর তর্কপঞ্চানন কোটালীপাড়া পরগণার জমিদারীর অংশীদার ও বিশিষ্ট সম্মানভাজন ব্যক্তি ছিলেন। কোটালীপাড়ার লোকে ইঁহাকে বিশ্বেশ্বর চৌধুরী বলিত। কোটালীপাড়ার অন্তর্গত উনুসিয়া গ্রামে ইহার বাটী ছিল। দুর্গাচরণ সেন মহাশয় আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে এবং পাণিনি ও কলাপ ব্যাকরণে সবিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন।

তাঁহার পরম আদরের বস্তু ছিল। দেশ-বিদেশের নানাবিধ বাদ্যজ্ঞ, নৃত্যজ্ঞ ও সঙ্গীতজ্ঞগণ আসিয়া সেন্‌ রাজার নিকটে কলাবিদ্যা প্রদর্শন করিতেন। তিনিও তাঁহাদের অভিজ্ঞতা পরীক্ষা করিয়া বিদ্যানুরূপ পুরস্কার প্রদান করিতেন। গুণীর গুণের আদরে তাঁহার যশোরাশি অচিরে সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। বিশেষতঃ গুণিগণ সকলেই জানিতে পারিলেন যে, মাধবনারায়ণ যুবা হইলেও, কি শাস্ত্রমীমাংসায় কি আরব্য, পারস্ত, উর্দ্দু ও হিন্দী ভাষা-জ্ঞানে, কি সঙ্গীতে, কি বাদ্যে—সর্ব্ববিষয়ে জ্ঞানী, অথচ বিনয়-গুণে তিনি নিজের পাণ্ডিত্য-প্রকাশে একেবারে বিমুখ।

মাধবনারায়ণের পূর্ব্বপুরুষগণের সময় হইতে নিয়ম ছিল যে, শ্রীশ্রীশারদীয়া পূজা উপলক্ষে নবম্যাদি কল্প হইতে শতাবৃত্তি চণ্ডীপাঠ হইত। বিষয়-সম্পত্তি যখন বিভক্ত হইতে লাগিল, তখন দুর্গাপূজা ও শতাবৃত্তি চণ্ডীপাঠও পৃথক্ হইয়া পড়িল। তখনও মাধবনারায়ণ ও নরনারায়ণের দুর্গাপূজা এক সঙ্গেই হইত; পরে উভয়ে পৃথক্‌অন্ন হইলে পূজাও পৃথক্ হইয়া যায়। এই সময়ে মাধবনারায়ণ নিয়ম করিলেন যে, সংস্কৃতাভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ব্যতীত কেহই শতাবৃত্তি চণ্ডীপাঠ করিতে পারিবেন না। এইরূপ নিয়ম করিবার তাঁহার দুইটী উদ্দেশ্য ছিল। প্রথম উদ্দেশ্য—চণ্ডী শুদ্ধরূপে পাঠ এবং দ্বিতীয় উদ্দেশ্য—সংস্কৃত শিক্ষায় ব্রাহ্মণগণকে উৎসাহ-দান। তাঁহার

প্রাচীন ন্যায়শাস্ত্রেও ইঁহার সমধিক অধিকার ছিল। কলিকাতা কাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলে ইনি নেটিভ ডাক্তারী পরীক্ষা পাশ করিয়াছিলেন। ইনি ঢাকা বিভাগের খ্যাতনামা চিকিৎসক ছিলেন। ইঁহার পুত্রই প্রসিদ্ধ চিকিৎসক শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ সেন। বৃন্দাবন চন্দ্র সেন মহাশয়ের আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে ও ব্যাকরণে সুগভীর পাণ্ডিত্য ছিল। ইনি মস্তিষ্ক-বিকৃত ও বাত ব্যাধির চিকিৎসায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ইঁহার এক পুত্র বরিশালের ভূতপূর্ব্ব জেলা-জজ শ্রীযুত অন্নদাচরণ সেন। অপর পুত্র শ্রীযুত অক্ষয়কুমার সেন বরিশালের সুপ্রসিদ্ধ উকীল, আর এক পুত্র শ্রীযুত গোপালগোবিন্দ সেন কবিরাজ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। উক্ত তিনজন সভাপণ্ডিতই সেনরাজার পরলোকের পর লোকান্তরিত হয়েন।

এই নিয়ম তিনি স্বগ্রাম ও অন্যান্য গ্রামের জ্ঞাতিবর্গ এবং জলাবাড়ী কীর্ত্তি-পাশা, আমড়াজুলি, বাসণ্ডা প্রভৃতি স্থানের সম্পন্ন ব্যক্তিগণকে অনুসরণ করিতে অনুরোধ করিলেন। এই নিয়ম সকলেই সাদরে গ্রহণ করিলেন এবং স্থির করিলেন যে, নবদ্বীপ হইতে কোন ব্রাহ্মণসন্তান পাঠ সমাপন করিয়া ফিরিলে প্রথমতঃ মাধবনারায়ণের সভায় তাঁহাকে পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিতে হইবে। তাঁহার সভা তাঁহাকে পণ্ডিত বলিয়া গ্রহণ করিলে প্রথমে তাঁহাকে মাধবনারায়ণের বাটীতে শতাবৃত্তি চণ্ডীপাঠে নিযুক্ত হইতে হইবে এবং তাঁহাকে গুণানুযায়ী বার্ষিক দিবার ব্যবস্থা হইবে। মাধবনারায়ণ যাঁহাকে পণ্ডিত বলিয়া বিবেচনা না করিবেন, তিনি কোনও স্থানে চণ্ডীপাঠে ব্রতী হইতে পারিবেন না এবং বার্ষিকও পাইবেন না। তাহাতে মাধবনারায়ণ নিয়ম করিলেন যে, নবদ্বীপের পাঠ-সমাপনান্তে যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত প্রথম বৎসর তাঁহার সভায় পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিবেন, সভা তাঁহাকে পণ্ডিত বলিয়া গণ্য করিলে প্রথম বৎসর তিনি পাথেয় ব্যতীত আর কিছু পাইবেন না; দ্বিতীয় বৎসরে তিনি শতাবৃত্তি চণ্ডীপাঠে নিযুক্ত হইবেন এবং গুণানুসারে বরাবর বার্ষিকও পাইবেন। তাঁহার বাটীতে ব্রতী হইলে ও বার্ষিক পাইলে আর কোনও স্থানেই চণ্ডীপাঠ ও বার্ষিক-প্রাপ্তিতে তাঁহার বাধা ঘটিত না। এই নিয়ম অদ্যাপি তাঁহার পুত্র নগেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন।

মাধবনারায়ণের সময়ে যে সকল প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন তাঁহাদের কয়েকজনের নাম উল্লেখিত হইল:—কমলাকান্ত সার্ব্বভৌম, চণ্ডীচরণ তর্কবাগীশ, কাশীশ্বর ন্যায়রত্ন, প্রসন্নচন্দ্র শিরোমণি, মহামহোপাধ্যায় রামনাথ সিদ্ধান্তপঞ্চানন, কালীনাথ তর্কপঞ্চানন, হরকুমার তর্কতীর্থ, তারাপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন

* পণ্ডিত তারাপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশের গুরু।

প্রভৃতি। নগেন্দ্রনারায়ণের সময়ে কমলাকান্ত সার্ব্বভৌম ব্যতীত অপর সকলে জীবিত ছিলেন। এখন যে সকল পণ্ডিত চণ্ডীপাঠে ব্রতী আছেন ও বার্ষিক পাইয়া থাকেন তাঁহাদের মধ্যে আশুতোষ স্মৃতিতীর্থ, রামলাল স্মৃতিতীর্থ, গোপালচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ, গিরীশচন্দ্র স্মৃতিরত্ন, নীলমাধব স্মৃতিতীর্থ, শশিকান্ত তর্কতীর্থ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

এতদ্ব্যতীত সেজরাজা তাঁহার স্বর্গীয় পিতার ন্যায় বদান্যতায় যৌবনেই অশেষ কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। পিতৃ-মাতৃ-দায়গ্রস্ত, কন্যা-দায়গ্রস্ত, ঋণগ্রস্ত কিংবা কোনও বিপদগ্রস্ত যে কোন লোক তাঁহার শরণাপন্ন হইতেন, তাঁহাদের কাহাকেও তিনি বিমুখ করিতেন না। নিজে কাহারও সমুদয় দায় দূর করিতে না পারিলে জ্ঞাতিদিগের নিকটেও তাহার দায় বিমোচনের সাহায্যের জন্য অনুরোধ করিতে ইতস্ততঃ করিতেন না। এইরূপে যুবা হইলেও মাধবনারায়ণের কর্ম্মদক্ষতার খ্যাতি অল্প দিন মধ্যেই এতদূর পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল যে, রায়েরকাঠী, বনগ্রাম, চিংড়াখালী ও মঘিয়ার জ্ঞাতিগণ সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতে লাগিলেন। দিব্যমূর্ত্তি, সর্ব্ববিদ্যার আধার, কন্দর্পকান্ত, পিককণ্ঠ যুবা সেজ রাজার সঙ্গে যাঁহার একবার ঘটনাক্রমে আলাপ হইত তিনি জীবনে আর তাঁহাকে বিস্মৃত হইতে পারিতেন না। বিনা কার্য্যেও শুধু তাঁহার মধুময় কথা শুনিবার জন্য ও তাঁহার নিরুপম কান্তি দর্শনের জন্য সেই ব্যক্তিকে পুনঃ পুনঃ সেজরাজার নিকট আসিতে হইত।

মাধবনারায়ণ নানা কার্য্যের মধ্যেও পশুপক্ষী-পালনের বড়ই পক্ষপাতী ছিলেন। সেজ রাজার চিড়িয়াখানা তখন উক্ত জেলাস্থ সকলের একটী প্রধান দর্শনীয় বস্তু হইয়া উঠিয়াছিল। উহাতে হাতী, ঘোড়া, বাঘ, নানা জাতীয় কুকুর ও কাকাতুয়া, ময়না, হীরামন, লালমোহন, টীয়া ও অপরা-

পর পাখী, খরগোস, গিনিপিগ, বিলাতী ইন্দুর প্রভৃতি অনেকগুলি প্রাণীরও সমাবেশ করিয়াছিলেন। কলিকাতা হইতে তিনি এক খানি পালকী গাড়ী ও একখানি বগী গাড়ী আনাইয়াছিলেন। উহাতে চড়িয়া তিনি ভ্রাতাকে ও জ্ঞাতিদিগকে লইয়া দামোদর-তীরে সমীর-সেবনে বাহির হইতেন। কখন বা তিনি সভ্রাতৃক জ্ঞাতিগণসহ হস্তি-পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া বিচরণ করিতেন। মাধবনারায়ণের আরও দুইটী চড়িবার ঘোড়া ছিল। তিনি ঘোড়ায় চড়িতে এবং তীর-ধনুকে ও ব্যায়ামে পারদর্শী ছিলেন। তিনি বন্দুক ছুড়িতেও বিশেষ অভ্যস্ত ছিলেন। তাঁহার শারীরিক বলও বিলক্ষণ ছিল। অলসতা তাঁহার চক্ষু-শূল ছিল।

মাধবনারায়ণ ধর্ম্মনিষ্ঠ, ন্যায়পরায়ণ মহাপুরুষ ছিলেন। শত বিপদ-পাতের সম্ভাবনা হইলেও তিনি তাঁহার ধর্ম্মনিষ্ঠা বা ন্যায়পরায়ণতা হইতে পরাঙ্মুখ হইতেন না। মাধবনারায়ণের সুব্যবস্থায় পৈতৃক ঋণ যাহা বাকী ছিল তাহা ক্রমশঃ পরিশোধ হইয়া আসিতে লাগিল। এই সময়ে এক ব্যক্তি তাঁহার নিকট কর্ম্মপ্রার্থী হইয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি পূর্ব্বে মাধবনারায়ণের জ্ঞাতির নিকট কর্ম্ম করিতেন। মাধবনারায়ণ তাঁহাকে উপযুক্ত দেখিয়া কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। উত্তরকালে এই কর্ম্মচারী দ্বারাই তাঁহার যে সর্ব্বনাশ হইয়াছিল তাহা পরে বিবৃত হইল। এদিকে আবার তিনি যে সমুদয় সম্পত্তি নিলাম হইয়া গিয়াছিল, উহাদেরও পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সেজ রাজা দেখিলেন, তাঁহার গ্রামটি একটি ছোট খাট সহর হইলেও উহাতে একটি বাজার না থাকায় লোক-জনের বড়ই অসুবিধা হইতেছিল। যে দুই চারিখানি সামান্যমাত্র দোকান ছিল, উহাতে গ্রামস্থ লোকের দৈনিক অভাবও দূর হইত না। বিশেষ কোনও উৎসব কিংবা কর্ম্ম পড়িলে তাহাদিগকে সুদূর হাটে বা

বাজারে যাইতে হইত। কেবল গ্রামস্থ লোক লইয়াই রায়েরকাঠী গ্রাম তখনও গঠিত হয় নাই; বহু বিদেশী লোক আসিয়াও নানা কার্য্য-ব্যপদেশে রায়েরকাঠীতে প্রায় বার মাস বাস করিত। তাই সেজ-রাজা তাঁহার প্লাকা রাস্তার প্রথম ও দ্বিতীয় সেতুর মধ্যবর্ত্তী স্থানে রাস্তার দুই পার্শ্বে একটি বাজার বসাইলেন। বাজারটি প্রত্যহ সকালে বসিত এবং প্রায় দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত থাকিত। এই বাজারে গৃহস্থালীর উপযুক্ত সমুদয় জিনিষই পাওয়া যাইত। বিস্তর বিদেশী দোকানী আসিয়া সেজ রাজার অনুমতিক্রমে বাজারে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দোকান পাতিয়া বসিল। উহাতে ডাইল, চাউল তৈল, লবণ, মরিচ, গুড়, বাতাসা, চিনি প্রভৃতি মুদীর ও সন্দেশ, রসগোল্লা ও অন্যান্য মোদকের দোকানের জিনিস দিবারাত্র সব সময়েই পাওয়া যাইত। বাজারটি ক্রমশঃ একটি উচ্চ শ্রেণীর কারবারের স্থান মধ্যে গণ্য হইয়া উঠিল। তখন সেজ রাজা ঐ বাজার হইতে মজুমদার-বাড়ী পর্য্যন্ত ব্যাপী স্থান লইয়া সপ্তাহে একদিন করিয়া দিবা দ্বিপ্রহর হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত স্থায়ী একটি হাট পত্তন করিলেন। রায়েরকাঠীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্রীশ্রীকালী মাতার নামানুসারে ঐ হাটের নাম হইল, "কালীগঞ্জের হাট"। ঐ হাটে নানা দেশ-দেশান্তর হইতে নানাবিধ দ্রব্যসম্ভার আমদানি হইত এবং এ দেশজাত দ্রব্যসকল দেশ-বিদেশে রপ্তানি হইত। মাধবনারায়ণের কীর্ত্তি-নিদর্শন এই হাট ও বাজার আর এখন বিদ্যমান নাই। এই হাট ও বাজার যে ভাবে নষ্ট হইয়াছিল তাহার বিবরণ পরে যথাস্থানে লিপিবদ্ধ হইল।

ছোট রাজা সৌন্দর্য্যে অগ্রজ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ন্যূন হইলেও অসাধারণ সুন্দর পুরুষ ছিলেন। তিনি বঙ্গভাষা ও সঙ্গীতশাস্ত্রে সবিশেষ ব্যুৎপত্তি ও দেশ-বিদেশে অসামান্য খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পাথো-

য়াজ, তবলা, ঢোলবাদ্য যে একবার শুনিয়াছে তাহার পক্ষে উহা বিস্মৃত হইবার উপায় ছিল না। তাঁহার হাতের বোলগুলি এমন স্পষ্ট ও মধুর ছিল যে, সমস্ত বাঙ্গালা দেশ কেন, সমগ্র ভারতে এরূপ সুস্পষ্ট অথচ মধুর পাখোয়াজ, তবলা, ঢোলবাদ্য কেহ কখনও শুনেন নাই। বঙ্গ-ভাষানুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি সংস্কৃত-চর্চ্চাও করিতেন। অগ্রজের ন্যায় তাঁহার কথাগুলিও বড় মিষ্ট ছিল। যাঁহার সঙ্গে একবার তাঁহার কোন প্রসঙ্গে আলাপ হইত, তিনি আর ছোট রাজার পক্ষপাতী না হইয়া থাকিতে পারিতেন না। তিনি বাল্যকাল হইতেই অতিশয় আমোদপ্রিয় ছিলেন। তাঁহার বৈঠকখানা সর্ব্বদা আমোদ, প্রমোদ, কৌতুক, তামাসায় মুখরিত থাকিত। পরোপকার-বিষয়েও ছোট রাজা মুক্তহস্ত ছিলেন। কিন্তু প্রবৃত্তি-শাসন তাঁহার কখনও অভ্যস্ত হয় নাই; তাই খেয়ালবশে অনেক সময়ে অনেক অবিবেচনার কার্য্য করিয়া পরে দারুণ অনুশোচনা ভোগ করিতেন। কনিষ্ঠ পুত্রকে বিজ্ঞ ও গুণসম্পন্ন জানিয়া জননী রাণী অম্বিকাসুন্দরীর আগ্রহাতিশয্যে মাধবনারায়ণ নাবালক বয়সেই তাঁহার বিবাহ দিয়াছিলেন। ১২৬৪ সালে যশোহর জেলার অন্তর্গত ষোলখাদা গ্রাম নিবাসী "মধ্যাংশ দ্বিতীয়ের পো" কুলীন শ্রীযুক্ত মধুসূদন ঘোষ মহাশয়ের কন্যা সর্ব্বগুণালঙ্কৃতা শ্রীমতী বসন্তকুমারীর সঙ্গে তাঁহার শুভ-বিবাহকার্য্য সম্পাদন করাইয়াছিলেন। মধুসূদন বাবু তখন বাখরগঞ্জের অন্তর্গত পিরোজপুরে মুন্সেফের কার্য্য করিতেন। এই বিবাহোপলক্ষে রাণী অম্বিকা রাজবাড়ীর উপযুক্ত আমোদ-প্রমোদ ও সমাজশুদ্ধ লোকের ভোজন প্রভৃতিতে প্রভূত অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন।

পতি-গৃহ-শোভিনী বসন্তকুমারী কালে নানাবিধ শিল্পবিদ্যায় এবং বাঙ্গালা সাহিত্যানুশীলনে অসাধারণ দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত "বাসন্তিকা" এবং রুগ্নাবস্থায় লিখিত "রোগাতুরা বসন্ত-

কুমারী" গীতি-কাব্যসাহিত্যে প্রশংসনীয় স্থান অধিকার করিয়াছিল। পতি নরনারায়ণও খ্যাতনামা সাহিত্য-সেবক হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার বিরচিত "সুনীতি নাটক", "বাসববিজয় নাটক", "ধ্রুব-চরিত্র" "যোষিদ্বিজ্ঞান" প্রভৃতি গ্রন্থগুলি তাঁহার সাহিত্য-সাধনার পরিচায়ক। ফলতঃ যোগ্য পতি ও পত্নীর মিলনে উঁহাদের দাম্পত্য আদর্শস্থানীয় হইয়াছিল। পতি ও পত্নী একপ্রাণ ও একধর্ম্ম হইয়া আজীবন দাম্পত্য-সুখে কাটাইয়া গিয়াছেন। সন ১৩১৬ সালের ১৪ই অগ্রহায়ণ নর-নারায়ণের মৃত্যু হয়। কি আশ্চর্য্য! বৃদ্ধ বয়সে পতির মৃত্যুবার্ত্তা শুনিয়া পতিপ্রাণা বলিলেন, "তিনি একটু অগ্রে গিয়াছেন। আমিও সত্বর যাইব, আবার মিলন হওয়া চাই"। এই বলিয়া তিনি যে শয্যাশ্রয় করিলেন তাহা হইতে আর উঠিলেন না। ১ মাস ১৮ দিনের দিন অর্থাৎ ১৩১৬ সালের ২রা মাঘ রাত্রি ১১টার সময়ে তাঁহার প্রাণপাখী দেহপিঞ্জর হইতে মুক্ত হইয়া পরলোকগত পতির মুক্তাত্মার সঙ্গে মিলিত হইল। এরূপ আদর্শ দাম্পত্য আজকাল জগতে নিতান্ত বিরল।

নরনারায়ণ ও বসন্তকুমারী বিলাতের সুপ্রধান কবি-দম্পতী রবার্ট ব্রাউনিঙ্ ও এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিঙের ন্যায় আদর্শ দাম্পত্যসুখের অধিকারী হইয়াছিলেন। তাঁহারা বাঙ্গালা সাহিত্যের যে যুগে সাহিত্য-সেবায় নিরত ছিলেন তখন এদেশে সাহিত্যিকের সংখ্যা নিতান্ত বিরল ছিল। বরিশাল জেলার সর্ব্বত্রই ছোট রাজা ও ছোট রাণীর বিরচিত গ্রন্থগুলি সাদরে অধীত হইত। গ্রন্থগুলিও ভাষা-গাম্ভীর্য্যে, ভাববৈভবে, এবং হৃদয়ভাব-জ্ঞাপনে সদ্গ্রন্থমালার মধ্যে স্থানলাভ করিবার সম্পূর্ণ যোগ্য। উঁহাদিগের বিশেষ মহত্ব এই যে, স্ত্রীশিক্ষার সেই শৈশব-যুগে উঁহারা লোকনয়নে সমাজ-কল্যাণের জন্য স্ত্রীশিক্ষার উপযোগিতা বিশদভাবে দেখাইয়া দিয়াছেন। 'বাসন্তিকা'র কবিতাগুলি এখনও অনেকে পরমা-

নন্দে আবৃত্তি করিয়া থাকেন। কিন্তু ছোট রাজার বাদ্যবিষয়ক পাণ্ডিত্যই দেশ-বিদেশে সর্ব্বত্র তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। তদানীন্তন প্রিন্স অফ্ ওয়েল্‌স সপ্তম এডওয়ার্ড যখন কলিকাতায় আগমন করেন, তখন তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য যে সকল দেশীয় বাদ্যযন্ত্র ও বাদকের সমাবেশ হয় উহাতে নরনারায়ণ একজন প্রধান বাদ্যকার মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত যখন তিনি কলিকাতায় আসিতেন তখন যেখানেই উচ্চ শ্রেণীর বাদ্যযন্ত্র-বাদনের ব্যবস্থা হইত সেখানেই ছোট-রাজার নিমন্ত্রণ থাকিত এবং সর্ব্বত্রই তাঁহার বাদ্যশ্রবণে শ্রোতাগণ মুগ্ধ হইতেন। এইরূপে ভারতীয় সঙ্গীতচর্চ্চায় সর্ব্বস্থানেই ছোট-রাজার নাম প্রধান যন্ত্রবাদক বলিয়া তৎকালে কীর্ত্তিত হইত। তাঁহার সমসাময়িক মুরলী বাবু, কেশব মিত্র ও গোপাল মল্লিক প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বাদকগণ সকলেই একবাক্যে নরনারায়ণের বাজনার প্রশংসা করিতেন।

মাধবনারায়ণের সর্ব্ববিষয়ে কার্য্যদক্ষতায় আত্মীয়স্বজন ও তাঁহার পরিচিত ব্যক্তিমাত্রই পরম প্রীতিলাভ করিতেন বটে; কিন্তু ইহাতে তাঁহাদের এষ্টেটের ধূর্ত্ত কর্ম্মচারিগণ বড়ই শঙ্কান্বিত হইয়া পড়িলেন। ধীমান্ চতুর মাধবনারায়ণ তাঁহাদের ধূর্ত্তামি ও এষ্টেটের অর্থ আত্মসাৎ-করণের বিষয় না জানিতেন এমন নহে, তবে একেবারে তাঁহাদের নিকট হিসাব-নিকাশ ইত্যাদি চাহিলে উঁহারা গৃহবিচ্ছেদ ঘটাইয়া সর্ব্বনাশ উপস্থিত করিতে পারেন, এই মনে করিয়া উঁহাদের নিকটে পূর্ব্বের কোনও হিসাব-নিকাশ চাহিলেন না। কিন্তু তিনি এমনভাবে তাঁহার সমস্ত কার্য্যকর্ম্ম চালাইতে লাগিলেন যে, উঁহাদের আর অবৈধ আয়ের পথ রহিল না। তখন দুর্ব্বৃত্ত কর্ম্মচারিগণ ষড়যন্ত্রে প্রবৃত্ত হইল। তাহারা প্রথমে নরনারায়ণের নিকট মাধবনারায়ণের বিরুদ্ধে নানাপ্রকার দোষারোপ

করিতে আরম্ভ করিল এবং তাঁহাকে বুঝাইতে লাগিল, সেজ-রাজা আপনাকে বঞ্চনা করিবার চেষ্টা করিতেছেন। আমরা তাঁহার দুরভিসন্ধির খবর পাইয়াছি। এইরূপে বুঝাইয়া যখন নরনারায়ণকে তাহারা আপনাদের মতাবলম্বী করিয়া হস্তগত করিল, তখন রাণী অম্বিকার নিকটেও মাধবনারায়ণের বিরুদ্ধে তাহারা নানারূপ অভিযোগ করিতে লাগিল। ক্রমে তাঁহাকেও বিশ্বাস করাইল যে, সেজ রাজা ছোট রাজাকে প্রতারিত করিয়া পথে বসাইবার চক্রান্ত করিতেছেন। আমরা আপনাদের উভয়ের কর্ম্মচারী, উভয়ের অন্নে প্রতিপালিত, একজনে অপরকে বঞ্চনা করিতেছে, আপনি কিছুই দেখেন না, আপনাকে আপনার ভ্রাতা বঞ্চনা করিবেন, ইহাতে আমাদের যোগ দেওয়া অধর্ম্ম, তাই আপনাকে জানাই যে, এখনও পৃথক হ'ন, নচেৎ একেবারে পথে দাঁড়াইবেন।

তীক্ষ্ণবুদ্ধি মাধবনারায়ণ লোক-প্রমুখাৎ কর্ম্মচারীদিগের এই কুটিল ষড়যন্ত্রের কথা জানিতে পারিয়া মর্ম্মাহত ও নিতান্ত ক্লিষ্ট হইলেন, কিন্তু প্রকাশ্যে কিছু বলিলেন না। এই ষড়যন্ত্রে যে দুর্বৃত্ত কর্ম্মচারীদিগের অনেকেই লিপ্ত আছেন তাহা বুঝিতে তাঁহার একটুও বিলম্ব হইল না। তিনি গুপ্ত অনুসন্ধানে অবগত হইলেন যে, দুই তিনজন সাধারণ কর্ম্মচারী ব্যতীত আর সকলেই তাঁহার প্রতিকূলে এই ষড়যন্ত্রে যোগদান করিয়াছেন। এমন কি, তাঁহাদের দেওয়ান এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজেন্দ্রনারায়ণের বিধবা পত্নী শিবশঙ্করীর কর্ম্মচারী পর্য্যন্ত উহাতে লিপ্ত হইয়াছে। একদিন মাধবনারায়ণ যাঁহাকে নিতান্ত দুরবস্থাপন্ন দেখিয়া আশ্রয় দিয়াছিলেন এবং যাঁহার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া, যাঁহার উপর প্রভূত বিশ্বাস স্থাপন করিয়া প্রধান কর্ম্মচারিপদে উন্নীত করিয়াছিলেন, সেই ব্যক্তি

এবং মদনমোহন চক্রবর্ত্তী নামক অপর একজন দুষ্ট ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারী এই ষড়যন্ত্রের প্রধান নেতা হইয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন, তাঁহার স্বর্গগত পিতার পবিত্র সংসার-গগনে বিপত্তির কাল মেঘ ঘনীভূত হইয়াছে। বিষম ঝঞ্ঝাবাত্যার আর বড় বিলম্ব নাই। ইহাতে তাঁহাদের সোণার সংসার একেবারে ছারখার হইবে। রাণী মা যাইবেন, প্রাণের ছোট ভাই নরনারায়ণ যাইবে, তিনিও যাইবেন; কেহই থাকিবে না। এ যে করাল কালরূপী মহাভূমিকম্প! মাধবনারায়ণ কিয়ৎকাল কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলেন ও পবিত্রতারূপিণী জননীর মনশ্চাঞ্চল্য লক্ষ্য করিয়া তিনি ক্ষণকালের জন্য অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। কিন্তু তিনি আশৈশব অতীব ধৈর্য্যশালী ছিলেন; এই অলৌকিক ধীরতা তাঁহার জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তাঁহাকে ত্যাগ করে নাই। তিনি স্থিরবুদ্ধিতে ভবিষ্যতের দিকে চাহিলেন। দেখিলেন, অভ্যুন্নতির পন্থা দারুণ কণ্টকাকীর্ণ, বিষয়-সম্পত্তি বিষম বাত্যা-বিক্ষোভ-মধ্যবর্ত্তী, রক্ষার আর কোনও উপায় নাই; এমন কি আপনার প্রাণ পর্য্যন্ত সঙ্কটাপন্ন। তাঁহার এই ভূয়োদর্শন পরে বর্ণে বর্ণে ফলিয়াছিল।

মাধবনারায়ণ তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। প্রাণের ভাই পর হইবে, তাহার সঙ্গে বিরোধ করিতে হইবে; এই সমস্ত কথা ভাবিয়া তাঁহার চিত্ত নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িল। তিনি কনিষ্ঠকে আহ্বান করিয়া বিরলে তাঁহাকে অনেক বুঝাইলেন; এমন কি তাঁহাকে বলিলেন, 'ভাই, তুমিই বিষয়-কর্ম্মের কর্ত্তৃত্ব কর; আমাকে এখানে থাকিতে বল থাকিব; না হয়, বিদেশে গিয়া বাস করিব। ভাই, তুমি ও আমি এক রক্ত-মাংসে গঠিত; আমাদের মধ্যে কি কোনও রূপে মনোমালিন্য বা বিরোধ হইতে পারে?' মাধবনারায়ণের কথায় নরনারায়ণ কর্ম্মচারীদিগের মন্ত্রণার কথা ভুলিয়া

গেলেন। দাদার কথাই ঠিক বুঝিয়া লইলেন। কিন্তু দাদার নিকট হইতে বাহির হইবামাত্র দুষ্ট কর্ম্মচারিগণ আবার তাঁহাকে জ্যেষ্ঠের প্রতিকূলে কুমন্ত্রণা দিতে আরম্ভ করিল। তাহার ফলে তিনি দাদার কথাগুলি সব ভুলিয়া গিয়া আবার তাঁহাকে প্রবল শত্রু মনে করিলেন। মাধবনারায়ণ যখন তিন চারি বার এইরূপে কনিষ্ঠকে বুঝাইয়াও বিফল-মনোরথ হইলেন, তখন জননী রাণী অম্বিকার নিকটে গিয়া তাঁহার চরণ-যুগল ধারণপূর্ব্বক অশ্রুপূর্ণনেত্রে সমুদয় নিবেদন করিলেন। মাতা পুত্রের তাদৃশ ব্যাকুলতা দেখিয়া অশ্রুসম্বরণ করিতে পারিলেন না। তিনি পুত্রের প্রতিকূলে সমস্ত অভিযোগ ভুলিয়া গেলেন এবং কর্ম্মচারীদিগের তাদৃশ ব্যবহারের কথা জানিয়া উহাদের উপর অত্যন্ত বিরক্ত ও রুষ্ট হইলেন। মাধবনারায়ণ মাতার পদধূলি গ্রহণ করিয়া বাহিরে গমন করিলেন। মাতা ও পুত্রের পুনরায় মিলনে সংসার শান্তিময় হইল।

কর্ম্মচারীরা যখন দেখিল,—রাণী অম্বিকা ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মাধব-নারায়ণে পুনরায় মিলন হইল, তখন তাহারা বুঝিল, এইবার তাহাদের সর্ব্বনাশ হইবে। সেইজন্য তাহারা কনিষ্ঠ নরনারায়ণকে নানাবিধ কুপরামর্শ দিয়া জ্যেষ্ঠের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিল এবং তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া সকলে রাণী অম্বিকা চৌধুরাণীর নিকটে উপস্থিত হইল। নরনারায়ণ মাতার নিকটে আসিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন এবং কর্ম্মচারিগণও নরনারায়ণের ভবিষ্যৎ অমঙ্গলের আশঙ্কার বিষয় উত্থাপিত করিয়া কপট অশ্রুবর্ষণে গণ্ডদেশ ভাসাইয়া দিল। সরলা জননী কর্ম্মচারীদের কুটিল বাক্যজাল ভেদ করিয়া প্রকৃত রহস্য বুঝিতে অক্ষম হইয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। তিনি একে ত নিতান্ত ধর্ম্ম-প্রাণা সতী সাধ্বী রমণী ছিলেন, ধর্ম্মকর্ম্ম ব্যতীত আর কিছুই তাঁহার চিত্তে স্থান পাইত না। তাঁহার হৃদয় অকপট ছিল। জটিলতা কুটিলতা

তাঁহার বুদ্ধির অগম্য। তাঁহার সত্যনিষ্ঠা, ধর্ম্মপ্রাণতা, শ্রদ্ধা ও ভক্তির জন্য সকলে তাঁহাকে দেবী বলিয়া মনে করিতেন। পুত্রদ্বয় পৃথক্ হইবে এবং পরস্পরে বিবাদ করিবে, ইহা ভাবিয়া জননীর প্রাণ নিতান্তই আকুল হইয়া পড়িল।

দৈবের গতি অব্যাহত, কে তাহা রোধ করিবে? মাধবনারায়ণ অসাধারণ পুরুষকারসম্পন্ন লোক হইলেও দৈবের গতি রোধ করিতে পারিলেন না। মাতার চরণে পুনঃ পুনঃ নিবেদন করিয়া, কনিষ্ঠকে শতবার বুঝাইয়া, কুচক্রীদের ষড়যন্ত্র ভেদ করিতে পারিলেন না। কর্ম্মচারীদের দিবারাত্র কুমন্ত্রণায় জননীর মন মাধবনারায়ণের প্রতিকূলে ধাবিত হইল; ফলে কর্ম্মচারীদের প্ররোচনায় নরনারায়ণ মাধবনারায়ণের সহিত পৃথক হইলেন। দৈবের জয় হইল, কুচক্রীদের মনস্কামনা পূর্ণ হইল। মাধবনারায়ণের জীবনের ভীষণ পরীক্ষা আরম্ভ হইল। ভগবান্ বিপদে ফেলিয়া লোককে শ্রেষ্ঠ করেন। মাধবনারায়ণের পক্ষেও বোধ হয় তাহাই ঘটিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

জননী রাণী অম্বিকা কোনও পুত্রের পক্ষাবলম্বন করিলেন না। তাঁহার নিজের সম্পত্তির আয় হইতেই তাঁহার সচ্ছন্দে চলিয়া যাইত। মাধবনারায়ণ বাহিরবাটীর দোতলায় কাছারী করিতেন, নর-নারায়ণ নীচের তলায় কাছারী করিতে লাগিলেন। দুষ্ট কর্ম্মচারীদিগের প্ররোচনায় প্রায় রোজই উভয় পক্ষের মধ্যে দারুণ দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও গোলযোগ হইতে লাগিল। মাধবনারায়ণ কনিষ্ঠকে ডাকিয়া সকল বিষয়ের মীমাংসা করিয়া দিতেন। নরনারায়ণ প্রথম প্রথম দাদার কথায় সমস্ত গোলযোগ মিটাইয়া লইতেন। কিন্তু শেষে কর্ম্মচারীদিগের অলীক কথায় বিশ্বাস করিয়া অগ্রজকে আর বিশ্বাস করিতেন না। ক্রমে গোলমাল বাড়িয়া যাইতে লাগিল; মাতা কিংবা অগ্রজের কথায় আর কোনও ফল হইত না। তখন জননী, গুরুদেব, পুরোহিত মহাশয় ও বিশেষ বিশেষ আত্মীয়গণকে আনয়ন করিয়া স্বামীর অস্থাবর জিনিসপত্র, প্রাচীন হস্তলিখিত পুরাণ ও তন্ত্রাদি এবং নীলামের অবশিষ্ট বিষয়-সম্পত্তি ও যে সকল সম্পত্তি তিনি নিজের অর্থে নীলামে ক্রয় করিয়াছিলেন সেইগুলি উভয় পুত্রের মধ্যে পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রথানুযায়ী বিভাগ করিয়া দিবার প্রস্তাব করিলেন। তদনুযায়ী প্রথমে সমুদয় অস্থাবর সম্পত্তির বিভাগ হইল। এই বংশের পূর্ব্বপুরুষদিগের রীতি-অনুযায়ী বণ্টনকারিগণ মাধবনারায়ণকে কিছু অধিক দিলেন; কিন্তু মাধবনারায়ণ তাহা লইলেন না। কনিষ্ঠের প্রতি তাঁহার এমনই স্নেহ ও মমতা ছিল যে, তিনি বণ্টনকারিগণকে তুল্য ভাগ করিতে বলিলেন। তুল্য ভাগ হইলে এক ভাগ তিনি গ্রহণ করিলেন এবং বাটী ও বাটীর দালান-কোঠা ও ঘর-দরজা সমভাগে বিভক্ত হইল।

অতঃপর বিষয়-সম্পত্তিও অর্দ্ধাংশ লইতে চাহিলেন; কিন্তু গুরু, পুরোহিত ও আত্মীয় স্বজনগণের নিতান্ত অনুরোধে পূর্ব্বপুরুষদিগের রীতি অক্ষুণ্ণ রাখিতে নামমাত্র জ্যেষ্ঠোত্তর গ্রহণে সম্মত হইলেন, উহাতে বণ্টককারিগণ বগা-নামক একখানি সামান্য আয়ের সম্পত্তি জ্যেষ্ঠোত্তর নির্দ্দিষ্ট করিয়া বাকি সম্পত্তি তুল্য ভাগ করিয়া দিলেন। *

পূর্ব্বে এই বংশের নিয়ম ছিল যে জ্যেষ্ঠ পুত্রই সম্পত্তির অধিকারী হইতেন, অন্য পুত্রগণ তাঁহার অধীন থাকিয়া জায়গীর-স্বরূপ কতক ভূসম্পত্তির ভোগ দখল করিতেন। কয়েক পুরুষ গত হইলে আত্ম কলহে এই নিয়ম ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। অতঃপর জ্যেষ্ঠ দুই ভাগ ও অন্যেরা সমভাগে পৈতৃক বিষয় সম্পত্তি ভোগ দখল করিতেন। এই দুই ভাগের এক ভাগ জ্যেষ্ঠোত্তর বলিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্র পাইতেন। কালক্রমে জ্যেষ্ঠ একখানি করিয়া শ্রেষ্ঠ তালুক জ্যেষ্ঠোত্তর পাইতেন। মাধব নারায়ণের এই সৌজন্যে ও ভাতৃস্নেহে সকলেই মোহিত ও চমৎকৃত হইলেন। মাধব নারয়েণের পর হইতে সেই জ্যেষ্ঠোত্তর প্রথাও উঠিয়া গিয়াছে। † এক্ষণে সকল পুত্রই পৈতৃক সম্পত্তি সম অংশে ভোগ দখল করেন। ভূসম্পত্তির বিভাগ সুবিধা জনক হইল না।

মাধব নারায়ণ মহালে মহালে ভাগের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিলেন, কিন্তু দুষ্ট কর্ম্মচারীদিগের প্ররোচনায় নর নারায়ণ কিছুতেই বাধ্য

---

* এই বগা তালুক এখন মাধব নারায়ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুত গিরীন্দ্র নারায়ণের ভোগ দখলে আছে। গিরীন্দ্র নারায়ণ রাজা বাবু নামেই খ্যাত।

† এই বংশে ক্ষত্রিয় রাজোচিত কতিপয় প্রথা এখনও বিদ্যমান আছে। যথা বিজয়া দশমী উপলক্ষে তরবারি লইয়া যাত্রা করা, মধ্যে মধ্যে মৃগয়ায় বহির্গত হওয়া, বিবাহ সভায় জ্যেষ্ঠ পুত্র বর্ত্তমান থাকিতে তদপেক্ষা অধিক-বয়স্ক বা সম্পর্কে গুরুস্থানীয় জ্ঞাতিগণের মাল্য চন্দন লাভে অনধিকার ইত্যাদি।

হইলেন না। প্রতি মহালের প্রতি প্রজাই নরনারায়ণের এজমালী রহিল অর্থাৎ প্রতি মহালের প্রতি প্রজার নিকট হইতেই উভয়ে আপন আপন সম পরিমাণ খাজনা আদায় করিতেন। এইরূপ বিভাগের মূলেও দুষ্ট ষড়যন্ত্রকারী কর্ম্মচারিগণ ছিলেন, কেন না মহালে মহালে বিভাগ হইয়া গেলে আর কোনই গোলমাল থাকিত না। তাহা হইলে তাঁহাদের অসদুপায়ে উপার্জ্জনের পথ সঙ্কীর্ণ হইয়া যাইত এবং উহাদের আদর ও কমিয়া যাইত। সুতরাং পৃথক্ হইয়াও ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের নিবৃত্তি হইল না; বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। শান্তির সংসারে অশান্তির চির আবাস বিরাজিত রহিয়া গেল। মাধব নারায়ণ রায়ের কাটীতে যে একটী বাজার ও কালীগঞ্জের হাট নামক একটী হাট বসাইয়াছিলেন, খাল মজিয়া আসায় সেই হাটের অবস্থা খারাপ হইয়া আসিতেছিল। তাহার উপর নরনারায়ণের কর্ম্মচারীদের অত্যাচারে হাটটী একেবারে উঠিয়া গেল। মাধব নারায়ণ ইহাতে বড়ই দুঃখিত হইলেন। বাজারটীর প্রতিও উক্ত কর্ম্মচারিগণের অত্যাচার চলিয়াছিল; কিন্তু মাধব নারায়ণ বাজারের দোকানী পশারীদের অনেক বুঝাইয়া এবং কর্ম্মচারিগণ কৃত ক্ষতি নিজ হইতে পূরণ করিয়া দিয়া তাঁহার জীবিত কাল পর্য্যন্ত বাজারটীর অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর নর নারায়ণের কর্ম্মচারী ও ভৃত্যদের অত্যাচারে বাজারটী উঠিয়া যায়।

রাজা মহেন্দ্র নারায়ণের ষ্টেটের সদর কাচারিতে ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য ব্যতীত অপর জাতীয় কোন কর্ম্মচারী ছিল না, কেন না মহেন্দ্রনারায়ণের বিশ্বাস ছিল যে উচ্চবর্ণের কর্ম্মচারিগণ কখন অবিশ্বাসী হইবে না। কিন্তু দারুণ অর্থ লোভে তাঁহাদিগকে এমনই বিচলিত করিয়াছিল যে তাঁহারা ক্ষুদ্র স্বার্থে অন্ধ হইয়া প্রভুর প্রতি কর্ত্তব্য ও কৃতজ্ঞতা একেবারে

বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলেন। পিতার অধিক প্রভুর অনিষ্ট-পাতে তাঁহাদেরও নিপাত যে অবশ্যম্ভাবী ইহা এই সকল দুষ্ট কর্ম্মচারীরা বুঝিতে পারিতেন না। পারিলে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য এষ্টেটটী অতলে ডুবাইয়া দিতে বসিতেন না। হায়, অর্থ লালসা! তুমি নর-সমাজে বিদ্যমান থাকিয়া ভগবানের শ্রেষ্ঠ জীব মানবকে প্রতিপদে পশুরও অধম করিতেছ। ধন্য তোমার দুর্দ্দমনীয়া শক্তি ও অপরাজেয় আকর্ষণ!

রাজা মহেন্দ্র নারায়ণের অনেকগুলি কর্ম্মচারী ও দাস দাসী ছিল। এই ভ্রাতৃ বিভাগে পুরাতন কর্ম্মচারী ও দাস দাসীদিগেরও বিভাগ হইল। কর্ম্মচারীদিগের বিভাগ হইবার পূর্ব্বেই মাধব নারায়ণের সেই নব নিয়োজিত প্রধান কর্ম্মচারী ও মদন মোহন চক্রবর্ত্তী নামক জনৈক ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারী উভয়েই নর নারায়ণের কর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রথমেই তাঁহারা নর নারায়ণকে লইয়া পৃথক্ হ'ন।

জ্যেষ্ঠ যাহাদিগকে বিভাগে পাইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীদের অনেকেই রাত্রে গোপনে অপর পক্ষের কর্ম্মচারীদিগের সঙ্গে যোগ দান করিতে লাগিলেন। মাধব নারায়ণের কুশাগ্র বুদ্ধির নিকটে তাঁহাদের কোনও দুরভিসন্ধি অজ্ঞাত রহিল না। তাঁহার নিয়োজিত চরের মুখে সকলই তিনি জানিয়া পরে সুযোগমত উহার প্রতিবিধান করিয়াছিলেন। রাজা মহেন্দ্রনারায়ণের দেড়শত খানসামা ছিল। মাধবনারায়ণ ও নরনারায়ণের সময়ে উহাদের সকলে জীবিত ছিল না। পুরাতন ও নূতন নিয়োজিত খানসামায় তখন ৮২ জন ছিল। উহাদের ৪১ জন নরনারায়ণ বাছিয়া লইলেন, বাকী ৪১ জন মাধবনারায়ণের রহিল।

এই সকল খানসামাদের মধ্যে অনেকে আবশ্যক মত লাঠিয়ালের কার্য্যও করিত। ইহারা সাহসিকতা ও কর্ত্তব্য-নিষ্ঠায় স্ব স্ব প্রভুর নিতান্ত বিশ্বাস-ভাজন ছিল। শিক্ষিত সদ্বংশজাত কর্ম্মচারিগণ মধ্যে যে মনুষ্যত্ব একেবারে লোপ পাইয়াছিল, নিরক্ষর, নীচ-বংশ-সম্ভূত এই খানসামাদের মধ্যে সেই প্রভুভক্তি ও মনুষ্যত্ব অনেক সময় অভাবনীয় রূপে পরিলক্ষিত হইত।

* পৈতৃক পরিচারিকাদের মধ্যে অভয়া দাসী মাধব নারায়ণকে প্রতিপালন করিয়াছিল, সে মাধব নারায়ণের পক্ষেই রহিল। সুমিত্রা নরনারায়ণকে প্রতিপালন করিয়াছিল, সে নরনারায়ণের পরিবারভুক্ত হইল। অন্যান্য পরিচারিকা ও পাচক ব্রাহ্মণগণ দুই ভাগে তুল্যরূপে বিভক্ত হইল। এতদ্ব্যতীত লাঠীয়াল, দ্বারবান, সর্দ্দার প্রভৃতিও সম বিভক্ত হইয়া দুই পক্ষে আশ্রয় পাইল। ঐ সব বিভক্ত লাঠিয়াল এবং সর্দ্দারগণের মধ্যে কেহ কেহ কখন কখনও অর্থলোভে বশীভূত হইয়া এক পক্ষ ছাড়িয়া পক্ষান্তরে যোগ দিত বটে, কিন্তু পরিচারক ও পরিচারিকাগণ আজীবন স্ব স্ব প্রভুর কার্য্য বিশ্বস্তরূপে নির্ব্বাহ করিয়া গিয়াছে।

অম্বিকা চৌধুরাণীর কর্তৃত্ব কালে কর্ম্মচারীদের ষড়যন্ত্রে যে সকল সম্পত্তি নিলাম হইয়া গিয়াছিল উহার উল্লেখ আমরা পূর্ব্বেই করিয়াছি। সেই সকল সম্পত্তির মধ্যে তেলিখালি তালুক ও সেলিমাবাদ পরগণার ৵১০৷ গণ্ডা জমিদারির অংশ এবং ৵১৮॥ গণ্ডা জমিদারি ও উহার অন্তর্গত জোলাগাতী ও দৈহাড়ী তালুক ঢাকার নবাব খাজে আবদুল গণি নিলামে ক্রয় করিয়াছিলেন। মাধব নারায়ণ তদীয় অনুজ নরনারায়ণ ও মাতা অম্বিকা চৌধুরাণীর নিকটে প্রস্তাব করিলেন যে তাঁহারা দুই ভাই একবার ঢাকায় যাইয়া নবাব বাহাদুরকে ধরিয়া দেখিবেন, যদি তিনি টাকা পাইলে তাঁহাদিগের

সম্পত্তিগুলি ছাড়িয়া দেন। হয়ত তাঁহাদের অনুরোধে নবাব বাহাদুর দয়া প্রণোদিত হইয়া টাকা পাইলে ছাড়িয়া দিতেও পারেন।

কনিষ্ঠকে লইয়া ঢাকায় যাইবার অপর উদ্দেশ্যও ছিল। সেজ রাজা * মনে করিলেন আমরা দুই ভাই এখানে না থাকিলে বিবাদ বিসংবাদ কম হইবে, এবং বিদেশে একত্র থাকায় হয়তো দুই ভাইয়ের মধ্যে সমুদয় মনোমালিন্য একেবারে মিটিয়া যাইবে। সুতরাং ঢাকা যাইবার প্রস্তাবটী তাঁহার অনেক চিন্তার ফল।

এদিকে প্রজাগণ তাঁহাদিগকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিত। তাহারা বলিয়াছিল যে নবাব সাহেবের ঐ সকল সম্পত্তি ফিরাইয়া দেওয়ার অভিমত হইলে তাহারা পরস্পরে চাঁদা করিয়া উহার অধিকাংশ টাকা দিবে।

মাধব নারায়ণ এই প্রস্তাব অবশ্য সর্ব্বাগ্রে জননীকে জানাইয়া ছিলেন এবং মাতা অম্বিকাও সানন্দে উহাতে অভিমত প্রদান করিলেন। কিন্তু অনুজের এষ্টেটের কর্ম্মচারীদিগের বিনা অনুমোদনে ছোটরাজা পদ মাত্রও সঞ্চালনে অক্ষম। সেই জন্য মাধবনারায়ণ ভাগিনী হরসুন্দরীকে দিয়া এই প্রস্তাব কনিষ্ঠের নিকট জানাইলেন। হরসুন্দরী এই প্রস্তাব সাদরে গ্রহণ করিলেন, কেন না তেলিখালি তালুকের অধীন তাঁহার পিতৃদত্ত যে সম্পত্তি ছিল তাহাও এই প্রস্তাবে মুক্ত হইবার সম্ভাবনা। তেলিখালি ভ্রাতারা মুক্ত করিতে না পারিলে তাঁহার পক্ষে প্রবল-প্রতাপ নবাবের কবল

---

*এখন হইতে আমরা স্থানে স্থানে মাধব নারায়ণকে সেজ রাজা ও নরনারায়ণকে ছোট রাজা নামে অভিহিত করিব, কারণ জনসাধারণের মধ্যে তাঁহারা এই নামেই পরিচিত।

হইতে তদধীন সম্পত্তি ভোগ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব; সুতরাং তিনি হৃষ্ট মনে ছোট রাজাকে, সেজ রাজার এই প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া ঢাকায় যাইতে বলিলেন। এদিকে সেজরাজার আশ্রিত সম্প্রতি ছোট রাজার পক্ষভুক্ত সেই কর্ম্মচারী যখন এই সংবাদ শ্রবণ করিলেন তখন তাঁহার ভয় হইল, যে ঢাকায় একত্র অবস্থানে উভয় ভ্রাতার পূর্ব্ব সম্প্রীতি আবার জাগিয়া উঠিবে এবং তাঁহাদের কর্ত্তৃত্ব যাইবে। এই আশঙ্কায় তিনি কয়েক জন দুষ্ট কর্ম্মচারী ছোট রাজার সঙ্গে দিলেন এবং বলিয়া দিলেন সেইখানে যাইয়া যাহাতে দুই ভ্রাতার মিলন না হয় তাহার ব্যবস্থা তোমরা করিবে। অতঃপর দুই ভ্রাতা জননীর পদধূলি গ্রহণ পূর্ব্বক ঢাকা যাত্রা করিলেন।

তখন ঢাকা সহরের অন্য নাম জাহাঙ্গীর নগর ছিল। উভয় ভ্রাতা জাহাঙ্গীর নগরে পৌঁছিয়া নবাব সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। নবাব সাহেবও বিশেষ সম্মান-সহকারে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিলেন। অতঃপর মাধব নারায়ণের নিকট তাঁহাদের আগমনের কারণ শুনিয়া তিনি বলিলেন, আপনাদিগকে এখানে কিছু দিন যাপন করিতে হইবে। ইতিমধ্যে আমার কর্ম্মচারীদিগের নিকট হইতে সমুদয় বিষয় অবগত হইয়া, আপনাদের প্রস্তাবের উত্তর দিব। নবাব সাহেবের উত্তরের প্রতীক্ষায় উভয় ভ্রাতাকে জাহাঙ্গীর নগরে কিছুদিন থাকিতে হইল। মাধব নারায়ণের আন্তরিক বাসনা ছিল ঐ সময়ে তাঁহারা উভয় ভ্রাতা একত্র বাস করেন। কিন্তু দুষ্ট কর্ম্মচারিগণ পূর্ব্ব হইতেই উঁহারা যাহাতে একত্রে বাস করিতে না পারেন তাহার ব্যবস্থা করিলেন। তাঁহারা নর নারায়ণের জন্য একটী পৃথক্ বাটী ভাড়া করিয়া তাঁহাকে লইয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন। নবাব সাহেব মধ্যে মধ্যে উঁহাদের উভয়ের বাসা বাটীতে আসিয়া সাক্ষাৎ করিতেন। উভয়

সহোদরও নবাব সাহেবের বাটীতে যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। তিনি অপরাহ্ণে উহাঁদের উভয় সহোদরের পরিভ্রমণের জন্য প্রত্যহ হাতী, ঘোড়া, কিংবা ঘোড়ার গাড়ী পাঠাইয়া দিতেন এবং উভয় ভ্রাতা উহাতে চড়িয়া সহরের নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিতেন। "ঘোড় দৌড়" প্রভৃতি আমোদ প্রমোদেও নবাব সাহেব উহাঁদের নিমন্ত্রণ করিতেন। মাধব-নারায়ণ তখন সদ্যো-বিজৃম্ভিতযৌবন এবং নর-নারায়ণ কৈশোর ও যৌবন-সন্ধি মধ্যস্থ ছিলেন। উভয় ভ্রাতার অলোক-সামান্য কন্দর্পকম কান্তি নবাব সাহেবের চিত্ত এতদূর আকৃষ্ট করিয়াছিল যে, তিনি প্রায় সব সময়ে অন্তঃপুরে গিয়া বেগম মহলে মাধব নারায়ণের অদৃষ্ট-পূর্ব্ব তপ্তকাঞ্চন কান্তি ও নির্দ্দোষ রমণীয় কলেবরের প্রশংসা করিতেন। প্রধানা বেগম সাহেবা তাদৃশ অপূর্ব্ব মনোহর দিব্য কান্তি পুরুষকে একবার দেখিবার জন্য নবাব সাহেবের নিকট বাসনা প্রকাশ করিলেন। তিনি উভয়-ভ্রাতাকে একদিন নিজ বাটীতে নিমন্ত্রণ করিলেন। উভয় ভ্রাতা নবাব বাটীতে উপস্থিত হইয়া স্ব স্ব আসন পরিগ্রহণ করিলেন। বেগম সাহেবা অন্তরাল হইতে মাধব নারায়ণকে দেখিয়া নবাব বাহাদুরকে অন্দরমহলে আহ্বান করিলেন এবং বলিলেন 'নিঃসন্দেহ আপনার অতিথি রঙ্ মাখিয়া আসিয়াছেন, তাহা না হইলে কি মানুষ এমন হইতে পারে?" নবাব বাহাদুর উচ্চ হাস্য পূর্ব্বক বলিলেন—"বেগম, তোমার ভুল হইয়াছে। রাজা বাবুর স্বাভাবিক বর্ণই এইরূপ তপ্ত কাঞ্চনের মত। আমি উহাঁকে রোজই ঐরূপ দেখিতেছি।" বেগম সাহেবা কিন্তু কিছুতেই উহা বিশ্বাস করিলেন না। তিনি একখানি রেশমের রুমাল গোলাপ জলে ভিজাইয়া নবাব বাহাদুরের হস্তে প্রদান করিয়া বলিলেন, "আপনি এই রুমালখানি দ্বারা আপনার অতিথির গাত্র মার্জ্জনা করিয়া

আমাকে ফিরাইয়া দিলে আমি বুঝিব উনি গায়ে রঙ্ মাখিয়াছেন কি না।" নবাব বাহাদুর উহা ভদ্রোচিত ব্যবহার নয় জানিয়াও বেগম-সাহেবার কৌতূহল নিবারণের জন্য. বিশেষতঃ তাঁহাকে মাধব নারায়ণের স্বাভাবিক রূপ-মাধুর্য্য প্রত্যক্ষ করাইবার জন্যই রুমাল খানি লইয়া বাহিরে আসিলেন। নানারূপ মধুর বাক্যে অতিথিকে প্রীত করিয়া শেষে বেগম সাহেবার কৌতূহলের কথা সমুদয় মাধব নারায়ণকে খুলিয়া বলিলেন। মাধব নারায়ণ হাস্য মুখে রুমালখানিদ্বারা নিজে গাত্র পুনঃ পুনঃ মার্জ্জনা করিয়া উহা নবাব বাহাদুরকে প্রত্যর্পণ করিলেন। নবাব বাহাদুর উহা বেগম সাহেবকে পাঠাইয়া দিলেন। বেগম সাহেবা রুমালে কোন রূপ রঙ্ লাগান না দিখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং একবাক্যে স্বীকার করিলেন যে, তিনি সত্য সত্যই এরূপ রূপবান্ পুরুষ কখনও দেখেন নাই।

নবাব বাহাদুর উহাঁদের উভয় ভ্রাতা অপেক্ষা অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। তিনি উভয় ভ্রাতাকে পরম যত্নে, আদরে ও আপ্যায়নে জাহাঙ্গীর নগরে রাখিলেন বটে; কিন্তু যে কার্য্যের জন্য তাঁহারা তথায় আসিয়াছিলেন উহার কিছুই হইল না। সুচতুর নবাব বাহাদুরের মধুর বাক্যে ও আদর আপ্যায়নে মুগ্ধ হইয়া উভয় ভ্রাতা ঢাকা নগরীতে চারি মাস কাল অতিবাহিত করিলেন। মহালের কর্ম্মচারী দিগকে আনাইয়া হিসাব পত্র দেখিয়া মীমাংসা করিব বলিয়া নবাব বাহাদুর দিনের পর দিন কাটাইয়া দিতে লাগিলেন। এদিকে ইহাঁরা নবাব বাহাদুরকে যে টাকা পরিশোধ করিয়া বাকি টাকার কিস্তিবন্দী করতঃ সম্পত্তিগুলি ছাড়াইয়া লইবেন মনে করিয়া আসিয়াছিলেন, সেই টাকাগুলিও ক্রমশঃ খরচ হইয়া যাইতে লাগিল। ইতি মধ্যে বাটীতে উভয় পক্ষীয় দুষ্ট কর্ম্মচারিগণ

পরস্পর দলবদ্ধ হইয়া নানারূপ বিবাদ বিসংবাদ আরম্ভ করিল এবং নিজ নিজ প্রভুর নিকটে বিপক্ষের নামে দোষারোপ করিয়া উত্তেজনাপূর্ণ পত্র লিখিতে লাগিল। উভয় ভ্রাতাকেই বাধ্য হইয়া গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইতে হইল। ফলতঃ নবাব বাহাদুরের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ও পরিচয়ই সার হইল।

গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া সুবুদ্ধি মাধব নারায়ণ উভয় ভ্রাতার মধ্যে বিবাদগুলির মীমাংসার জন্য বহু চেষ্টা করিলেন বটে; কিন্তু কার্য্যতঃ কিছুই হইল না, বরং বিবাদনল প্রচণ্ডবেগে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। অবিরত দাঙ্গা হাঙ্গামায় পাইক, ঢালি ও লাঠীয়ালগণের বেতনে এবং ফৌজদারী মোকদ্দমায় উভয় পক্ষের জলের মত অজস্র অর্থব্যয় হইতে লাগিল। এই প্রসঙ্গে তখনকার লাঠীয়ালদের সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা উল্লেখযোগ্য। এখন যেমন বিবাদের সম্ভাবনা হইলেই উভয় পক্ষ পুলিসের শরণ গ্রহণ করে, তখনকার দিনে বলে ও অর্থে নিতান্ত অক্ষম না হইলে কেহই পুলিশে যাইতেন না। জমীদারগণ এখনকার মত নিস্তেজ ছিলেন না। এই ভ্রাতৃ-বিরোধে প্রতি পক্ষেই সর্ব্বদা দুই তিন শত লাঠীয়াল প্রস্তুত থাকিত। তদ্ব্যতীত আবশ্যক মত পাঁচ সাত শত পাইক ও লাঠীয়ালের যোগাড় রাখিতে হইত। মাধব নারায়ণের জহিরদ্দী খাঁ নামে একজন বিখ্যাত লাঠীয়াল ছিল। সে চারিটী বর্শা একেসঙ্গে চালাইতে পারিত। মাধব নারায়ণের দ্বারবানদিগের মধ্যে শীতল সিংহ কুস্তি ও তরবারি ক্রীড়ায় সুদক্ষ ছিল। বস্তুতঃ তখনকার জমিদারগণকে দস্যু, তস্কর ও অন্যান্য দুষ্ট প্রজাদিগকে আয়ত্ত করিবার জন্য সর্ব্বদা এই সব লাঠীয়াল, ঢালী ও তরবারি-চালক লোক নিযুক্ত রাখিতে হইত। প্রকৃত প্রস্তাবে উহারা সৈন্য পদবাচ্য না হইলেও এই সব ঢালী, পাইক ও লাঠীয়াল জমিদারদিগের পক্ষে সৈন্যের কার্য্যই

করিত। সৈন্যদিগের ন্যায় ইহারা ও মাসিক বেতন ব্যতীত প্রতি বিজয়কার্য্যে ভূরি ভূরি পারিতোষিক পাইত। *

মাধব নারায়ণ দেখিলেন, এইভাবে কিছুকাল ভ্রাতৃবিরোধ চলিতে থাকিলে পৈতৃক ঋণ পরিশোধ হওয়া ত দূরের কথা, যাহা কিছু বিষয় সম্পত্তি এখনও বিদ্যমান আছে তাহাও নষ্ট হইয়া যাইবে। তিনি পুনরায় মীমাংসার প্রস্তাব করিয়া বলিলেন,—"এই বিবাদ আমাদের দুই সহোদরের মধ্যে না করিয়া নবাব সাহেবের সঙ্গে করিলে হয়'ত নষ্ট সম্পত্তির কতেক উদ্ধারও হইতে পারে।" এই কথা নর নারায়ণ এবং বিশেষতঃ ভগিনী হরসুন্দরীর মনোমত হইল। তাঁহারা উভয়ে হৃত-সম্পত্তির প্রজাগণকে আহ্বান করিলেন। আহূত প্রজাবর্গ সকলে রাজবাড়ীতে আসিয়া একবাক্যে প্রতিজ্ঞা করিল, তাহাদের বসতি বাটী পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে হইলেও তাহারা তাহা করিবে, কিছুতেই তাহারা নবাব বাহাদুরকে কবুলিয়ত দিবে না ও তাঁহার বাধ্য হইবে না।

আমারা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তখনকার প্রজাগণ জমিদারগণকে নিতান্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিত; জমিদারগণও প্রজাদিগকে অপত্য-নির্ব্বিশেষে পালন করিতেন। বিশেষতঃ রায়ের কাঠীর রাজারা প্রজাদিগের প্রকৃত পিতামাতার স্থান অধিকার করিয়াছিলেন; প্রজারাও তাঁহাদিগকে পিতামাতার ন্যায় ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিত এবং প্রাণপণে তাঁহাদের আদেশ পালন করিত। † বিশাই মাল, তিতাই মাল, জহির

---

* মাসিক মাহিয়ানা যাহাদের ছিল তাহারা ব্যতীত যাহারা নগদ টাকা লইয়া লাঠীয়ালের কার্য্য করিতে আসিত তাহাদিগকে পূর্ব্ব বঙ্গে নগদী বলিত।

† যে সকল সম্পত্তি রায়ের কাঠীর রাজাদের হস্তচ্যুত হইয়াছে সেই সকল সম্পত্তির প্রজাগণ এখনও তাহাদের পুরাতন মনিবের জন্য অশ্রুবিসর্জ্জন করে। বিশেষতঃ রায়ের কাঠীর রাজবাটীর বড় হিস্যার জমিদারগণ পূর্ব্ব হইতে এখন পর্য্যন্ত প্রজাপালনে চির প্রসিদ্ধ।

চাকর প্রভৃতি বলবান লাঠীয়ালগণ প্রজাদিগের নেতৃস্থান অধিকার করিয়া নবাব সাহেবের প্রতিকূলে দলবদ্ধ হইল। পূর্ব্বোক্ত লাঠীয়ালগণ মহেন্দ্র নারায়ণের আমোলে তাঁহার নিতান্ত বিশ্বাসী ভৃত্য ও প্রজা ছিল। মাধাবনারায়ণ ও নরনারায়ণের বিরোধ সময়ে উঁহারা কোন পক্ষই অবলম্বন করে নাই। বিশাইমাল তখন ঐ অঞ্চলে শ্রেষ্ঠ লাঠীয়াল বলিয়া গণ্য ছিল। শালপ্রাংশু, আজানুলম্বিত বাহু, বিশালবক্ষা, সিংহ-পরাক্রম বিশাইমাল যেমন সাহসিকতায়, বুদ্ধিমত্তায় ও কার্য্যদক্ষতায় সর্ব্বাগ্রগণ্য ছিল, সেইরূপ অসাধারণ প্রভুভক্তও ছিল। প্রভুর জন্য প্রাণ দিতে বিশাই কোন কালেই কুণ্ঠিত হইত না। বিশাইমালের অসাধারণ শক্তি সম্বন্ধে অনেক কাহিনী এখনও রায়েরকাঠী গ্রামে সর্ব্বদা কথিত হয়। উহাদের মধ্যে একটি কাহিনী এখানে উল্লিখিত হইতেছে। মহেন্দ্রনারায়ণের জীবদ্দশায় একদা শ্মশানকালী পূজা উপলক্ষে ইষ্টদেবতা ঠাকুর বাড়ীর খোলায় (বারোয়ারী তলায়) কবিগান হইতেছিল। ঐ সময়ে কবিগানের বড় সমাদর ছিল। উক্ত কবি শুনিতে হিন্দু মুসলমান বিস্তর লোক সমবেত হইয়াছিল। রাজবাড়ীরও অনেকে তথায় উপস্থিত ছিলেন। রাজা মহেন্দ্র নারায়ণ স্বয়ং তথায় উপস্থিত ছিলেন। হঠাৎ মুসলমান শ্রোতাদিগের মধ্যে পরস্পরে কলহ হইয়া ভীষণ দাঙ্গা উপস্থিত হইল। অন্যান্য শ্রোতারা ছত্রভঙ্গ হইয়া ভয়ে পলায়নের উপক্রম করিল। তখন রাজা মহেন্দ্রনারায়ণ বিশাইমালকে গোলমাল থামাইতে আদেশ করিলেন। বিশাই একটী গোটা বাঁশ লইয়া প্রায় দুইশত কিংবা আড়াই শত মুসলমানকে একদিকে চাপিয়া সভা মণ্ডপের বাহির করিয়া দিল। বিশাইমালের তাদৃশ বিক্রম-দর্শনে সভাস্থ সকলেই বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া রহিলেন। গোলোযোগকারী মুসলমানগণ আর কিছু করিতে সাহসী

হইল না; বিবাদ সহজে মিটিয়া গেল। সকলেই সানন্দে আবার কবি শুনিতে লাগিল।

প্রজাগণ এই বিশাইমাল, তিতাইমাল এবং জহির চাকর প্রভৃতির নেতৃত্বে নবাব সাহেবের প্রতিকূলে দলবদ্ধ হইল *। নবাব বাহাদুরও স্বীয় লাঠীয়ালগণ দ্বারা উহাদিগকে বশ করিতে চেষ্টিত হইলেন †। উভয় পক্ষের পুনঃ পুনঃ বীর্য্য পরীক্ষা হইতে লাগিল। উহাতে শত শত লোক হতাহত হইল। ফৌজদারী মোকদ্দমারও ক্রটী হইল না। মহেন্দ্রনারায়ণের সময় হইতে নিয়োজিত ঐ সকল মহালের নায়েব বরিশাল জেলার অন্তর্গত মৈশানি গ্রাম নিবাসী রামরাজা পালিত ও কৃষ্ণকান্ত পালিত নবাব সাহেবের নিকট হইতে উৎকোচ গ্রহণ করিলেন এবং সমুদয় কাগজ পত্র হিসাবাদি নবাব সাহেবকে প্রদান করিয়া তাঁহারই বাধ্য হইলেন। নবাব বাহাদুরও তাঁহাদের উভয়কে ঐ সকল মহালের নায়েব-পদে নিয়োজিত করিলেন। এই রামরাজা পালিত ও কৃষ্ণকান্ত পালিত মহেন্দ্রনারায়ণের অন্নে প্রতিপালিত। তাঁহারই প্রসাদে উহাঁদের বিপুল বিষয়-সম্পত্তি ও ক্রমোন্নতি হইয়াছিল। তাঁহারই চাকরি করিতে করিতে তাঁহাদের ক্রমে দশসহস্রাধিক মুদ্রা বার্ষিক আয়ের সম্পত্তি হইয়াছিল। কিন্তু কালের কি বিচিত্র পরিবর্ত্তন! আজ মহেন্দ্রনারায়ণের পুত্রদের দুঃসময়ে সেই রামরাজা ও কৃষ্ণকান্ত সমুদয় নিমকের বিষয় একেবারে বিস্মৃত হইয়া উৎকোচ লোভে শত্রু নবাব সাহেবের পক্ষে গমন করিলেন। অম্বিকা চৌধুরাণী লোকদ্বারা রামরাজাকে আনাইয়া তাঁহার পুত্রদের পক্ষ

---

* ইহাদের দলে অনেক লাঠীয়াল ছিল।

† এখনকার মতন তখন নবাবের সম্পত্তি ছিল না; তখনও সম্পত্তিশালী ও ধনী ছিলেন কিন্তু এখনকার মত নয়।

গ্রহণের জন্য বিশেষ অনুরোধ করিলেন। কিন্তু উহাতে কিছুই ফল হইল না। ইহাতে ধর্ম্মপ্রাণা চৌধুরাণী প্রাণে বড় ব্যথা পাইলেন এবং উক্ত রামরাজাকে অভিসম্পাত করিলেন,—"দেখ পালিত, তোমাদের অভীষ্ট কিছুতেই সিদ্ধ হইবে না, সত্বরই তোমরা অতি দীন নিরন্ন অবস্থায় পতিত হইবে। তোমাদের পাপের ইয়ত্তা নাই।" বলা বাহুল্য, সতী সাধ্বীর এই অভিসম্পাত বর্ণে বর্ণে ফলিয়াছিল। এই পালিতদের বিপুল বিষয় সম্পত্তি ক্রমশঃ কর্পূরের মত কোথায় উড়িয়া গেল; এমন কি শেষ অবস্থায় তাঁহাদিগকে মধ্যে মধ্যে উপবাসেও দিন কাটাইতে হইয়াছিল এবং তাঁহাদের দুর্দ্দশার সীমা ছিল না।

মাধবনারায়ণ ও নরনারায়ণের সঙ্গে বিবাদে নবাব সাহেবের অজস্র অর্থব্যয় হইতে লাগিল। বিবাদ-বিসংবাদের অনন্য-সহচর ফৌজদারী মোকদ্দমাও অবিশ্রাম চলিতে লাগিল। প্রতি মোকদ্দমায়ই বিশাই একজন প্রধান আসামী মধ্যে গণ্য হইতে লাগিল। অবশেষে আসামী-দিগকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য পুলিশ নিয়োজিত হইল। আসামী শ্রেণীর বিস্তর লোক পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হইল বটে; কিন্তু বহু চেষ্টাতেও পুলিশ বিশাইকে ধরিতে পারিল না। একদিন দারোগা মহাশয় (সব ইনস্পেক্টর) প্রায় দুই তিনশত লোকসহ রাত্রির শেষ প্রহরে বিশাই মালের বাটী ঘিরিয়া রহিলেন। দারোগা মহাশয় স্থির করিয়াছিলেন যে, প্রত্যুষে তাহাকে গ্রেপ্তার করিবেন। বিশাই সমুদায় জানিল; সেও রাত্রিতে বাহির হইল না বা পলাইবার চেষ্টা করিল না। অতি প্রত্যুষে তাহার দুই স্ত্রীকে দুই স্কন্ধোপরি স্থাপন করিয়া, এক হাতে একটী বন্দুক ও এক হাতে একখানি রাম দা (ছাগ, মেষ, বলি দিবার বড় দাওকে ঐ দেশে রাম দা বলে) লইয়া বিশাইমাল "আলি আলি" ডাক ছাড়িয়া বাহির হইল। তাহার তৎকালের সেই ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া পুলিশ

কিংবা দারোগা মহাশয় কেহই তাহার সম্মুখীন হইতে সাহসী হইলেন না। সে নিরাপদে নদী পার হইয়া স্ত্রীদ্বয়কে লইয়া চলিয়া গেল। সকলে ভয়, বিস্ময়ে একদৃষ্টে সেই দৃশ্যটি দেখিতে লাগিল। বিশাই এমনি বীর ছিল! আবার আচার, ব্যবহারে, বিনয় ও শিষ্টাচারে সে ভদ্রলোকের স্থান অধিকার করিয়াছিল। কবি ভবভূতি সত্যই বলিয়াছেন—"বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি, লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কোহ্ন বিজ্ঞাতুমর্হতি॥"

বিশাই গ্রেপ্তার হইল না; সুতরাং বিবাদ বিসংবাদ পূর্ণ মাত্রায়ই চলিতে লাগিল। রোজ রোজ খুন, জখম বিস্তর হইতে লাগিল। নবাব সাহেব মহাল দখল করিতে পারিলেন না। মাধব নারায়ণের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও বিশাই মালের অসাধারণ সাহস ও কার্য্যদক্ষতা নবাব সাহেবকে অত্যন্ত চিন্তাকুল ও উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিল। জলের মত অর্থ ব্যয় ও অগণ্য লোকজন ও লাঠীয়াল নিয়োজিত করিয়াও তিনি কিছুই করিয়া উঠিতে পারিলেন না। অবশেষে অনন্যোপায় হইয়া তিনি মীমাংসার প্রস্তাব করিলেন। নবাব সাহেব প্রস্তাব করিলেন—"তেলিখালি প্রভৃভি তালুক ব্যতিরেকে সেলিমাবাদের ৫১০। গণ্ডা জমিদারীর খরিদা অংশ এবং ৫৮॥ গণ্ডা জমিদারী ও তদধীন জোলাগাতী ও দৈহাড়ী তালুক আমি বিনা টাকায় রাজাদের ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত আছি। এতদ্ব্যতীত তেলিখালি তালুকের অধীন শ্রীযুক্তা হর সুন্দরীর যে সম্পত্তি আছে তাহারও উপযুক্ত মূল্য প্রদানে ক্রয় করিতে সম্মত আছি। রাজারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক সমুদয় বিবাদ বিসংবাদ মিটাইয়া ফেলুন।" হরসুন্দরী প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং নরনারায়ণকেও সম্মত করাইলেন। কিন্তু মাধবনারায়ণ কিছুতেই তাঁহার প্রাণের তেলিখালী ছাড়িতে সম্মত হইলেন না। অতঃপর, হরসুন্দরী নরনারা-

য়ণকে সঙ্গে করিয়া মাধবনারায়ণের নিকটে যাইয়া তাঁহাকে বলিলেন, 'ভাই, আমার কথা শুন। নবাব সাহেব একজন ধনবানব্যক্তি; জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, কমিশনার প্রায়ই তাঁহার বাটীতে নিমন্ত্রিত হয়েন। তাঁহার সঙ্গে বিবাদ বা মোকদ্দমায় পরিণামে আমরা নিশ্চয়ই নিষ্ফল হইব। ফলে যাহা তিনি খরিদ করিয়াছেন তাহা তাঁহারই থাকিবে। তথাপি দয়া পরবশ হইয়া আমাদিগকে বিনা অর্থে তেলিখালী বাদে আর সমুদয়ই ছাড়িয়া দিতে সম্মত আছেন। ইহাতে কি তোমার মত বুদ্ধিমান ব্যক্তির অমত করা উচিত? ভাই, তুমি সম্মতি দাও।' মাধবনারায়ণ বলিলেন, 'দিদি! এক তেলিখালীর সঙ্গে আর সমস্তের তুলনাই হয় না, কেননা তেলিখালিতে অনেক কর্ম্মচারী আত্মীয় স্বজন চাকর, নাপিত, ধোপা, ভুঁইমালী প্রভৃতি আমার পিতামহের ও পিতার দত্ত জমি প্রাপ্ত হইয়া সুখস্বচ্ছন্দে ভোগ করিতেছে ও আমাদের কার্য্য কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া আসিতেছে। ঐ তালুক আমরা ত্যাগ করিলে গণি মিঞা সাহেব তাহাদের উহা কি ভোগ করিতে দিবেন? তাহারা কি খাইবে? তাহারা পরিবার পরিজন নিয়া কোথায় দাড়াইবে? আমাদেরও মান সম্ভ্রম বজায় থাকিবে না। তাহা আপনি জানেন। উহা ছাড়িয়া দিয়া বাকী সম্পত্তি আনিয়া আমাদের কি ফল হইবে? উহাতে আমাদের বংশোচিত মান-সম্ভ্রম কিছুই রক্ষিত হইবে না; অথচ নবাব সাহেবের অনুগ্রহ প্রদত্ত দাসত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। তাহার পর জানিবেন, ইহা নবাব সাহেব দয়া করিয়া দিতেছেন না, তিনি যেমন বিবাদে পারিয়া উঠিতেছেন না, সেই-রূপ মোকদ্দমায়ও নিশ্চয়ই সুফল পাইবেন না, নীলাম রদ হইয়া যাইবে। তাই স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া এইরূপ আপাত-প্রীতিকর অনুগ্রহ প্রকাশের প্রস্তাব করিয়াছেন।' হরসুন্দরী মাধবনারায়ণের কথার সারবত্তা ভাবিয়া

দেখিলেন না। তিনি কেবল নিজের বিত্ত গুলির মূল্য স্বরূপ নগদ টাকার কথা ভাবিতে লাগিলেন। তাই যখন দেখিলেন মাধবনারায়ণ সহজে অভিমত দিবেন না; তখনই তাঁহার অমোঘ অস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। বুদ্ধিমতী নারী জানিতেন যে, মাধব নারায়ণ ভ্রাতার সঙ্গে একত্র থাকিতে পারিলে সর্ব্বস্ব ত্যাগেও কাতর হইবেন না, তাই তিনি রাজনীতি বিশারদ মন্ত্রীর ন্যায় বলিলেন, "দেখ ভাই আমি আর তোমাকে বেশী কি বুঝাইব? তবে এটি স্থির জানিও যে, তুমি এই মীমাংসায় সম্মত না হইলে নরনারায়ণ তোমার সঙ্গে আর যোগদান করিবে না। সে পৃথক ভাবে নবাব সাহেবের সঙ্গে মীমাংসা করিয়া লইবে। তোমায় একাকী নবাব সাহেবের সঙ্গে বিবাদ ও মোকর্দ্দমা করিতে হইবে। আমার অভিমত মত কার্য্য করিলে আর ভ্রাতৃ-বিরোধ থাকিবে না। তোমরা দুই ভাইয়ে একত্র হইয়া ঋণ পরিশোধ করিয়া হৃত সম্পত্তির অপেক্ষা আরও অনেক সম্পত্তি বাড়াইতে পারিবে। দেখ, এখন যাহা ভাল মনে কর তাহা কর।"

ভগিনীর এই প্রস্তাব সম্বন্ধে তিনি অনেক ভাবিলেন। তাঁহাদের এষ্টেটটীও ঋণজালে জড়িত; একাকী বিশিষ্ট ধনপতি নবাবের প্রতিকূলে বিবাদ ও মোকর্দ্দমা পরিচালনা অসম্ভব। অগত্যা তাহাকে ভগিনীর উপদেশ গ্রহণ করিতে হইল। অতঃপর নানারূপ পরামর্শ করিয়া স্থির হইল যে নরনারায়ণের কর্ম্মচারী মহাশয় দুই ভ্রাতার প্রতিনিধি-রূপে জাহাঙ্গীর নগরে যাইয়া মীমাংসা করিয়া আসিবেন। তদনুযায়ী দুই ভাই তাহাকে আম মোক্তার নামা দিয়া লোকজন সহ নবাব দরবারে পাঠাইয়া দিলেন। এই সমস্ত কার্য্যে মাধবনারায়ণের অবশ্য সরল মত ছিল না। কিন্তু অনন্যগতি হইয়া ও সর্ব্বোপরি পুনরায় সৌভ্রাত্রের আশায় উৎফুল্ল হইয়া তিনি

ভ্রাতার কথানুযায়ী তাঁহারই কর্ম্মচারীকে মীমাংসার জন্য ঢাকা সহরে পাঠাইতে বাধ্য হইলেন। উক্ত কর্ম্মচারী ঢাকায় রওনা হইবার কিয়ৎদিবসান্তে মাধবনারায়ণ তাঁহার খুল্লতাত পুত্র শ্রীযুত চন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী * মহাশয়ের সঙ্গে এইরূপ ধার্য্য করিলেন যে নবাব সাহেবের নিলাম খরিদা তেলিখালি তালুকের চারি আনা অংশ তাঁহারা দুই ভাই তাঁহাকে দিবেন এবং নীলাম রদের মোকদ্দমায় উচ্চতম আদালত পর্য্যন্ত যাবতীয় খরচ চন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী দিবেন। †

চন্দ্রনাথের অবস্থা তখন ভাল ছিল এবং ঘরেও তাঁহার বিস্তর টাকা মজুত ছিল। মাধব নারায়ণ চন্দ্রনাথের সঙ্গে সমস্ত স্থির করিয়া নরনারায়ণ ও হরসুন্দরীর অভিমত করাইলেন। বরিশালের উকিলগণও নিলাম রদ হইবে বলিয়া তাঁহাদিগকে একরূপ নিশ্চিন্ত করাইয়া ছিলেন। অতঃপর উভয় ভ্রাতা একযোগে বরিশাল আদালতে নবাব সাহেবের বিরুদ্ধে নিলাম রদের মোকদ্দমা উপস্থিত করিলেন। এদিকে একজন কর্ম্মচারীকে জাহাঙ্গীর-নগরে প্রেরণ করিলেন। সেখানে পূর্ব্ব প্রেরিত কর্ম্মচারী মহাশয়ের নিকটে সমস্ত কথা লেখা হইল এবং মীমাংসা না করিয়া তাহাকে ফিরিয়া আসিতে আদেশ করা হইল। কিন্তু মানুষ ইচ্ছা করিতে পারে মাত্র, গড়িবার হাত একমাত্র ভগবানের। সেই কর্ম্মচারী আমমোক্তার নামার বলে নবাব সাহেবের সঙ্গে তাঁহার পূর্ব্ব প্রস্তাবানু-

---

* ইনি শিবনারায়ণের তৃতীয় পুত্র বিশ্বনাথের পৌত্র। তিনি একজন তেজস্বী পুরুষ ছিলেন।

† তখন চন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী অপেক্ষা মাধবনারায়ণ ও নররায়ণের বিষয় সম্পত্তি অধিকতর থাকিলেও তাঁহারা তখন ঋণজালে বড়ই জড়িত ছিলেন এবং ঘরেও টাকা ছিল না।

যায়ী মীমাংসা করিয়া ফেলিলেন, সমস্ত চেষ্টাই বিফল হইল। এই সম্বন্ধে নানারূপ উক্তি গ্রামময় রাষ্ট্র আছে। কেহ কেহ বলেন কর্ম্মচারী-মহাশয় নবাবের নিকটে ৫০০০৲ পাঁচ হাজার টাকা উৎকোচ গ্রহণে রাজাদের প্রেরিত পত্র পাইয়াও মীমাংসা পত্র রেজিষ্টরী করেন। কর্ম্মচারি-মহাশয় রায়ের কাঠী প্রত্যাগমন করিয়া বলিলেন,—পত্র পাইবার পূর্ব্বেই মীমাংসাপত্র রেজিষ্টরি হইয়াছে এবং দেনা পাওনা শোধ হইয়াছে। কেহ কেহ আবার বলেন যে উক্ত উৎকোচের টাকার কিয়দংশ পত্রবাহী কর্ম্মচারীও পাইয়াছিলেন। * তবে প্রকৃত রহস্য নিগূঢ় অন্ধকারে বিলীন। ফলতঃ মাধবনারায়ণ ও নরনারায়ণ বিষম ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন। নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে।

মাধবনারায়ণ প্রথমতঃ উকিলদের সহিত পরামর্শ করিয়া সব দিক্ বজায় রাখিয়া নিলাম রদের মোকদ্দমা চালাইবেন স্থির করিলেন, কিন্তু নরনারায়ণের কর্ম্মচারী মহাশয় উহাতে রাজী হইলেন না। তিনি বুঝিলেন, উহাতে প্রথমেই তাঁহাকে বিপদে পড়িতে হইবে; কেননা তিনিই আমমোক্তার নামার বলে দলিল স্বাক্ষর করিয়া নবাব সাহেবকে দিয়া আসিয়াছেন; এক্ষণে মকদ্দমা হইলে তাঁহারই বিপদ। তজ্জন্য তিনি নরনারায়ণকে নানা স্তোকবাক্যে ভুলাইয়া নিলাম রদের মামলা চালাইতে অস্বীকৃত করাইলেন। চন্দ্রনাথও ইহাঁদের ভ্রাতাদের মধ্যে পরস্পরে অনৈক্য দেখিয়া টাকা দিতে চাহিলেন না। কথায় বলে "দশচক্রে ভগবান্ ভূত" হয়েন; মাধবনারায়ণেরও তাহাই ঘটিল; তাঁহাকে পাকে চক্রে পড়িয়া নিলাম রদের মোকদ্দমা

---

* ইনি মৃত্যুকালে বিষম আত্মগ্লানির জ্বালায় অধীর হইয়া উৎকোচ গ্রহণের বিষয় স্বীকার করিয়া ছিলেন।

হইতে বিরত হইতে হইল। অদৃষ্ট বিরূপ হইলে এইরূপই হয়। নীতিকার ঠিকই বলিয়াছেন—

"প্রতিকূলতাম্ উপগতে হি বিধৌ বিফলত্বম্ এসত্তি বহুসাধনতা"।

নরনারায়ণ ও মাধবনারায়ণ তেলিখালী হইতে চিরতরে বঞ্চিত হইলেন। কিন্তু তাঁহাদের পিতামহ প্রাণনারায়ণ-প্রদত্ত তেলিখালীর অন্তর্গত সম্পত্তি মাধবনারায়ণের পিসামহাশয় খানাকুল কৃষ্ণনগর-নিবাসী প্রকৃত মুখ্য কুলীনাগ্রণী শ্রীনাথ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের উত্তরাধিকারিগণ ভোগ করিতেছিলেন; কয়েক বৎসর গত হইল তাঁহারা উহা নবাব সাহেবকে বিক্রয় করিয়াছেন। কিন্তু মহেন্দ্রনারায়ণ প্রদত্ত সম্পত্তি বাগুটীয়া-নিবাসী চণ্ডীচরণ ঘোষ মহাশয়ের বংশধরগণ শ্রীযুত রাজেন্দ্র কুমার ঘোষ প্রভৃতি এখনও ভোগ করিতেছেন। নবাব সাহেব কিছুতেই উহা হইতে তাঁহাদিগকে বঞ্চিত করিতে পারেন নাই। এক তেলিখালী হইতে নবাব সাহেবের উত্তরাধিকারীবৃন্দের বার্ষিক আয় ৫০,০০০৲ টাকার অধিক। রায়ের কাঠির রাজবংশের অন্যান্য জমিদারের সহিত বিবাদে ইহাঁদের সম্পত্তি নষ্ট হয় নাই, বরং প্রতি বিবাদেই ইহাঁরা জয়ী হইয়াছিলেন। কিন্তু আত্ম কলহ এবং কর্ম্মচারী দিগের বিশ্বাসঘাতকতাই ইহাঁদের সর্ব্বনাশের হেতু এবং এখনও সেই কালাগ্নি ধিকি ধিকি জ্বলিতেছে।

পূর্ব্বোক্ত তেলিখালীতে মাধব নারায়ণের পিতামহ মহাত্মা প্রাণ-নারায়ণ কালিকা মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া কালী মাতার দৈনিক পূজার জন্য যে ১০০ বিঘা জমী দেবত্র ও পূজক ব্রাহ্মণকে তাঁহার বেতন ও জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য ২৪ বিঘা জমী ব্রহ্মোত্তর ও পরিচর্য্যাকারক-দিগকে নিষ্কর জমি দান করিয়াছিলেন, নবাব গণিমিঞার সহিত নিষ্পত্তির সময়ে সেই সকল জমি নবাব সাহেব খাস করিবেন না, এবং

যাহাতে সুশৃঙ্খলে পূজার কার্য্য সম্পন্ন হয় তাহার প্রতি মনোযোগ রাখিবেন, এইরূপ চুক্তি ছিল। তদবধি নবাব সাহেব কিংবা তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ কেহই উক্ত শ্রীশ্রীকালীমাতার পূজার কোনও ব্যাঘাত করেন নাই। নবাব গণি মিঞার সময়ে দেবীর মন্দির নদী কবলে নিপতিত হইতেছিল, ইহা জানিয়া নবাব সাহেব নদী হইতে দূরবর্ত্তী স্থানে নূতন মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তথায় শ্রীশ্রীকালীমাতার বিগ্রহ স্থানান্তরিত করাইয়াছিলেন। তদবধি কালী মাতার পূজা নবনির্ম্মিত মন্দিরেই হইয়া আসিতেছে। রাজা প্রাণনারায়ণের সময়ে যেরূপ পূজা হইত, এখনও তথায় সেইরূপ পূজাই হয় এবং প্রতি অমাবস্যায় ছাগাদি বলি হইয়া থাকে।

মুসলমান হইলে কি হয়, ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম অবগত হইতে পারিলে কোনও ধর্ম্মের প্রতি কাহারও বিদ্বেষ থাকিতে পারে না। বরং সকল ধর্ম্মের প্রতিই শ্রদ্ধার সঞ্চার হয়।

নবাব গণি মিঞার সহিত ইঁহাদের মীমাংসা হইয়া যাইলে তিনি কৃষ্ণকান্ত পালিত ও রামরাজা পালিতকে এক বৎসরের বেতন অগ্রিম দিয়া কর্ম্মচ্যুত করেন এবং বলেন,—"তোমরা চিরকাল যাঁহার অন্নে প্রতিপালিত, সামান্য অর্থলোভে যখন তাঁহাদের বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারিয়াছ, তখন তোমাদিগকে বিশ্বাস করা যায় না।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে যে ভ্রাতৃবিরোধের কথা উল্লিখিত হইয়াছে উহাতে মাধব নারায়ণ কিরূপ বিষম বিপদের মধ্যে নিপতিত হইয়াছিলেন উহার দুই একটী দৃষ্টান্তের উল্লেখ ব্যতিরেকে পাঠকবর্গের উহা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম হইবে না মনে করিয়া আমরা সর্ব্বাগ্রে দুই একটির উল্লেখ করিতেছি। ইহা হইতেই উপলব্ধি হইবে, যে অমৃতে কিরূপ ভীষণ গরল-উৎপত্তি হইতে পারে।

মাধব নারায়ণের নিয়ম ছিল যে, তিনি প্রত্যহ একস্থানেই ভোজন ক্রিয়া সম্পাদন করিতেন। আহার কালে যে সমস্ত গৃহপালিত মার্জ্জার তথায় উপস্থিত হইত তাহাদিগকে পৃথক্ করিয়া ব্যঞ্জনাদি-মিশ্রিত অন্ন খাইতে দিতেন। পরিবার বর্গের উহাতে বিরক্তি দর্শন করিলে তিনি বলিতেন, ইহারাও ভগবানের সৃষ্ট জীব। আমরা সকলেই যদি ইহা দিগকে খাইতে না দিয়া তাড়াইয়া দিই তাহা হইলে ইহারা কোথায় যাইবে, কিরূপে বাঁচিবে? মূক জীব মাত্রকেই আমাদের আহার দান কর্ত্তব্য। উহাতে আর কেহ তাঁহার নিকটে বিড়াল, কুক্কুর কিংবা অন্য কোনও গৃহপালিত পশুপক্ষীকে আহারও পানীয় দানে বিরক্তি প্রকাশ করিত না। সুতরাং সেজরাজার আহারকালে প্রত্যহ দশ পনেরটি বিড়াল আসিয়া একত্র হইত। সেজরাজা অন্তঃপুরে ভোজন করিতে আসিয়াছেন উহা যেন বিড়ালগুলি গণনা দ্বারা স্থির করিয়া রাখিয়াছিল; কারণ তাহারা ঠিক সময়ে আসিয়া হাজির হইত।

প্রতিপক্ষেরা জানিত যে, সেজ রাজা রোজই এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসিয়া আহার করিয়া থাকেন। দুষ্ট কর্ম্মচারীরা পরামর্শ করিয়া লোক

দ্বারা তাঁহার বসিবার দক্ষিণ দিকের প্রাচীরের অপর দিকের কয়েকখানি ইষ্টক বাহির করিয়া সামান্যমাত্র অবশিষ্ট রাখিয়া দিলেন। উদ্দেশ্য এই—যাহাতে মাধব নারায়ণের প্রকোষ্ঠ হইতে উহা দেখিতে পাওয়া না যায়। সেজরাজা প্রতিদিন যেমন রাত্রিকালে আহার করিতে অন্তর্বাটীতে যাইতেন ও যে কক্ষের যে নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসিতেন, সেই রাত্রিতেও তিনি নিয়ম মত ভোজনে উপবিষ্ট হইলেন। একটি চলিত কথা আছে—"রাখে কৃষ্ণ মারে কে, মারে কৃষ্ণ রাখে কে"। মাধব-নারায়ণের উপর আজ এই কথাটি পূর্ণ মাত্রায় খাটিয়া গেল।

দৈবাৎ নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে একটু সরাইয়া আজ বসিবার আসন বিন্যস্ত হইয়াছিল। মাধব নারায়ণও উহা লক্ষ্য না করিয়া আসনে উপবিষ্ট হইলেন। বিপক্ষের চর দেখিয়া গিয়াছিল যে, তিনি আহারের জন্য অন্তঃপুরে গিয়াছেন। চরের কথানুসারে প্রতিপক্ষ-নিয়োজিত হত্যাকারী আততায়ী আহারের সময় নিরূপণ করিয়া প্রাচীর গাত্রে নব বিরচিত রন্ধ্র-পথে মাধব নারায়ণকে লক্ষ্য করিয়া একটি সুতীক্ষ্ণ বর্ষা চালনা করিল। মাধব নারায়ণ দৈবাৎ সে দিন তাঁহার পোষ্য বিড়ালগুলিকেই সে দিকে আহার দিয়া ছিলেন। ঐ বর্ষার আঘাতে একটি বিড়াল বিদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ মেও মেও করিতে করিতে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। অন্যান্য বিড়ালগুলি ভয়ে লাফাইয়া উঠিয়া সেজ-রাজার অন্ন ব্যঞ্জনাদির উপরে পড়িয়া গেল; গ্লাসের জল চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। অবাক্ হইয়া মাধব নারায়ণ আহার্য্য পরিহার পূর্ব্বক উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তৎপরে লক্ষ্য করিয়া সমস্ত বুঝিতে পারিলেন এবং অবিলম্বে ভোজন কক্ষ ত্যাগ করিলেন। তদবধি তিনি রন্ধন-শালায় বসিয়াই আহার করিতেন ও চারিদিকে লোক রাখিয়া প্রহরীর কার্য্য করাইতেন।

দুষ্ট কর্ম্মচারিগণ ইহাতে বিফল-মনোরথ হইয়া নূতন ষড়যন্ত্রে প্রবৃত্ত হইলেন। সেজরাজাকে হত্যা করিবার জন্য নূতন হত্যাকারী নিয়োজিত করিলেন। ঐ ঘাতক একদা রাত্রিকালে অন্যের অলক্ষিত ভাবে একখানি শাণিত রামদা হস্তে মাধব নারায়ণের দোতলার শয়ন-কক্ষে তাঁহার পালঙ্কের নিম্নে লুকাইয়া রহিল। রাত্রি তৃতীয় প্রহরে যখন বাটীস্থ সকলেই নিদ্রার শান্তিময় ক্রোড়ে শয়িত, তখন দুরাত্মা শয্যাতল হইতে বাহির হইল এবং হত্যা করিয়া পলাইয়া যাইবার জন্য কক্ষের কপাট উন্মুক্ত করিল। মাধবনারায়ণ যে গৃহে শয়ন করিতেন তথায় সমগ্র রাত্রি একটী আলো প্রজ্বলিত থাকিত। ঘাতক পূর্ব্বেই সেই আলো নির্ব্বাণ করিয়া দিয়াছিল। কপাট খুলিবার শব্দে তাঁহার পত্নী শ্রীমতী কামিনী চৌধুরাণীর নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তিনি জাগরিত হইয়া দেখিলেন ঘরের আলো নির্ব্বাপিত; কিন্তু দরজা খোলা, তাহার পর বিশেষ নিরীক্ষণে দেখিলেন, কক্ষমধ্যে পালঙ্কের অনতিদূরে উজ্জ্বল রামদা হস্তে এক দীর্ঘকায় দস্যু। উহা দর্শন মাত্র প্রত্যুৎপন্নমতি মাধব-পত্নী তাঁহার লেপখানি দ্বারা স্বামীর সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া দিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। গৃহ-কর্ত্রীর আর্ত্তনাদে গৃহের অন্যান্য কক্ষের লোক-সকল জাগরিত হইল, তখন চারিদিক হইতে লোক আসিয়া পড়িল; ঘাতক প্রাণ-ভয়ে পলায়ন করিল। বহু অনুসন্ধানেও সে যে কে, এবং রাত্রির অন্ধকারে সে যে কোথায় লুকাইয়া পড়িল তাহা কেহ জানিতে পারিল না। তদবধি মাধব নারায়ণ আজীবন শয়ন-কক্ষের সম্মুখে বাহিরের দিকে একটী হিন্দুস্থানী দ্বারবানকে প্রহরীর কার্য্যে নিয়োজিত রাখিতেন এবং শয়ন করিবার পূর্ব্বে গৃহের সমুদয় স্থান অনুসন্ধান করিয়া দেখিতেন।

মাধব-ভগিনী হরসুন্দরী একজন অশেষ কীর্ত্তিমতী মহিলা বলিয়া পরিগণিত হইয়া গিয়াছেন। উহার ভূয়ঃ ভূয়ঃ নিদর্শন সর্ব্বত্র আছে। অল্প বয়সেই তাঁহাকে দারুণ বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছিল। পিতৃ-প্রদত্ত সম্পত্তি ও যৌতুকাদির উপস্বত্ব ভোগদখল করিয়া তিনি পিতৃ-সংসারেই জননীর পদসেবায় রত থাকিতেন। তিনি শ্রীক্ষেত্র, চন্দ্রনাথ, গয়া, কাশী, প্রয়াগ, বৃন্দাবন, মথুরা, কুরুক্ষেত্র, হরিদ্বার প্রভৃতি নানা তীর্থক্ষেত্র পর্য্যটন এবং সেই সকল স্থানের ক্রিয়া-কর্ম্মে প্রভূত অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। অতঃপর গৃহ-প্রত্যাগতা হইয়া রায়ের কাঠীতে শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী মাতার বাটীর উত্তর-পশ্চিম কোণে একটী সুবৃৎ নবরত্ন * প্রস্তুত করাইয়া উহার উপরি তলায় প্রস্তর নির্ম্মিত শ্রীরাধিকা ও শ্রীমদনমোহন বিগ্রহ ও নিম্ন তলায় প্রস্তর-নির্ম্মিত শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করেন। ঐ উপলক্ষে তিনি একটি নবাগ্নি যজ্ঞ সম্পাদন করিযাছিলেন। প্রোক্ত যজ্ঞে কাশী, কাঞ্চী, দ্রাবিড়, মিথিলা এবং বঙ্গদেশের পণ্ডিত ব্রাহ্মণ মণ্ডলী নিমন্ত্রিত হইয়া ১৬ টাকা হারে বিদায় প্রাপ্ত হন। উঁহাদের যাতায়াত ও রায়ের কাঠীতে অবস্থানের জন্য প্রত্যেকের দূরত্ব ও সম্মান অনুযায়ী পাথেয় দেওয়া হইয়াছিল। রাঘব, রবাহুত, ভট্ট এবং দরিদ্রগণ মনোমত অর্থ ও বস্ত্র লাভ করিয়া ছিল। ১৭৭৭ শকাব্দের বৈশাখে (বাঙ্গালা ১২৬২ সাল) এই মন্দিরোৎসর্গ ও উক্ত ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। গ্রামস্থ প্রাচীন লোকদিগের নিকটে শ্রুত হওয়া যায় যে, এই মন্দির নির্ম্মাণে চারি

* ১৩০৪ সালে ২রা জ্যৈষ্ঠ যে ভূমিকম্প হয় উহাতেই এই কীর্ত্তিস্তম্ভ নবরত্নটী নষ্ট হইয়াছিল।



হরসুন্দরীর নবরত্ন।   অভয়াদাসীর শিব-মন্দির।

বৎসর লাগিয়াছিল। এই মন্দির খুব উচ্চ ও সুবৃহৎ এবং নানারূপ কারুকার্য্য ভূষিত ছিল। হর-সুন্দরীর বিপুল কীর্ত্তির নিদর্শন সেই নবরত্ন এখন করাল কালের ধ্বংশ লীলায় বিধ্বস্ত। রাশি রাশি ধ্বংশাবশেষ এক্ষণে দর্শকদিগের কৌতুহল নিবৃত্তি করিতেছে।

হরসুন্দরীর পতিকুল বৈষ্ণব ছিলেন, সেই জন্যই তিনি বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া উক্ত নবরত্নের উপরের তলায় তাঁহার ইষ্টদেবতা শ্রীরাধিকা ও শ্রীমদনমোহনের প্রস্তর-নির্ম্মিত বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করেন। এই প্রতিভাময়ী মহিলা শ্রীমদ্‌ভাগবত পুরাণ শ্রবণান্তে উদ্‌যাপন করিয়া প্রভূত অর্থ ব্যয় করেন। অতঃপর তিনি বহু ব্যয়ে ধর্ম্মঘট ব্রত করিয়া উহার প্রতিষ্ঠা করেন। হরসুন্দরীর কীর্ত্তি কেবল মন্দির উৎসর্গে ও ব্রত নিয়ম-উদ্দযাপনে নিবদ্ধ ছিল না, লোকহিতকর কর্ম্মেও এই মহীয়সী নারীর কীর্ত্তি সর্ব্বাগ্রে ঘোষণীয়। ১৭৯০ শকাব্দে (বাঙ্গালা ১২৭৫ সালে) রাজবাটীর সম্মুখে তিনি একটী সুদীর্ঘ দীর্ঘিকা খনন করাইয়া উহার তিন পাড়ে তিনটী সুবৃহৎ ইষ্টক নির্ম্মিত ঘাট নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন; ইহাতে রাজবাটীর শোভা বিশেষ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। তিনি উহার প্রতিষ্ঠা কার্য্যে অনেক অর্থ ব্যয় করেন। এই দীর্ঘিকার সলিল-পানে অনেক দুরবর্ত্তী গ্রামের লোকেরাও উপকৃত হইয়াছে ও হইতেছে। হরসুন্দরীর দীর্ঘিকা ও সেতু অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়া তাঁহার বিপুল কীর্ত্তি-মেখলা বিঘোষিত করিতেছে। এতদ্ব্যতীত এই করুণাময়ী মহিলা কন্যাদায়গ্রস্ত, পিতৃমাতৃদায়গ্রস্ত বিস্তর লোকের দায় উদ্ধার করিয়া দিতেন। ব্রাহ্মণের উপনয়ন ও শুভ বিবাহ সম্পাদন তাঁহার বড়ই প্রীতিকর ছিল। বলা বাহুল্য, এই সকল পুণ্য-কার্য্যাবলিতে তাঁহার দুই সহোদর মাধবনারায়ণ ও নরনারায়ণ তাঁহার দুই হস্ত স্বরূপ ছিলেন।

মধবনারায়ণের হৃদয় কিরূপ মহৎ ও উচ্চ ছিল তাহার একটী দৃষ্টান্ত এইখানে লিপিবদ্ধ হইতেছে। মাধবনারায়ণ আপনাদের বাটীর পূর্ব্বদিকে মদন সরকারের বাটী পর্য্যন্ত একটী রাস্তা ইতি-পূর্ব্বেই তৈয়ারী করাইয়াছলেন। লোকের সুবিধার জন্য সেই রাস্তাটী পূর্ব্বদিকে ইষ্টদেবতা-ঠাকুর বাড়ী পর্য্যন্ত বাড়াইয়া দেওয়া হয়। তাহাতে সরিকগণের সহিত এজমালি ধোপাবাড়ীর কিয়দংশ ঐ রাস্তায় পড়ে। রাজকুমার রায় চৌধুরী প্রভৃতি তিন সরিক অর্থাৎ মেজ, সেজ এবং ছোট হিস্যার সরিকগণ রাস্তাটি নষ্ট করিয়া দিতে উদ্যত হন। এইজন্য তাঁহারা বিস্তর লাঠিয়াল ও সড়কিওয়ালা সংগ্রহ করিলেন। মাধবনারায়ণের পক্ষেও রাস্তাটী রক্ষা করিবার জন্য বহু লাঠিয়াল ও সড়কিওয়ালা নিযুক্ত হইল। মাধব-নারায়ণ ভাবিয়া দেখিলেন যে, এই বিবাদে বহু লোক হতাহত হইবে এবং ফৌজদারী মামলায়ও বিস্তর টাকা নষ্ট হইবে। তাই তিনি ডেপুটীমাজিষ্ট্রেটের নিকট শান্তিরক্ষার উদ্দেশ্যে পুলিশ মোতায়েন করি-বার জন্য দরখাস্ত করিলেন। হাকিম দরখাস্ত গ্রাহ্য করিলেন। ফলে একজন দারোগা ও দুইজন কনষ্টেবল শান্তিরক্ষার্থ তথায় প্রেরিত হইল। কিন্তু পুলিশ দেখিয়াও বিপক্ষগণ ভীত হইল না; বরং উহাদিগকে আক্রমণ করিয়া তাহারা দারোগাকে অপমানিত করিল ও কনষ্টেবল দুইজনকে প্রহার করিল।

মাধব নারায়ণ মনে করিয়াছিলেন, শান্তি রক্ষার জন্য যখন পুলিশ আসিয়াছে তখন আর দাঙ্গা-হাঙ্গামা হইবে না। এই ভাবিয়া তিনি তাঁহার পক্ষের অধিকাংশ লাঠিয়াল ও সড়কীওয়ালাকে বিদায় দিয়া-ছিলেন। কিন্তু তাঁহার বিপক্ষগণের দলে তখন বিস্তর লাঠীয়াল ও সড়কীওয়ালা ছিল, উহারা মাধব নারায়ণের রাস্তাটী কাটিয়া নষ্ট করিয়া

দিতে আরম্ভ করিল। মাধব নারায়ণের পক্ষে যে অল্প সংখ্যক লাঠীয়াল ও সড়কীওয়ালা ছিল, তাহারা সাহসে ভর করিয়া এবং দারোগা ও ও মনিবের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া বিপক্ষের বহুসংখ্যক লাঠিয়াল ও সড়কি ওয়ালার সম্মুখীন হইল। দাঙ্গা ক্রমে বাটীর নিকটে আসিয়া পড়িল। উভয় পক্ষেই বহুলোক আহত হইতে লাগিল। বিপক্ষেরা বাটী লক্ষ্য করিয়া ইষ্টক নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল। তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া মাধবনারায়ণ বৈঠকখানার দোতলা দালানের ছাদের উপরে উঠিয়া তীর ছুঁড়িতে লাগিলেন ও বিপক্ষের অনেক লাঠীয়ালকে আহত করিলেন। প্রতিপক্ষের দাঙ্গাকারীরা সম্মুখ দিকে সুবিধা হইল না দেখিয়া অন্দর মহলের দিকে চড়াও হইল। সেই সময়ে অবস্থা সঙ্কটাপন্ন দেখিয়া মাধবনারায়ণের বিশ্বস্ত অনুচর গোরাচাঁদ ঢালী বন্দুক লইয়া গুলি করে। ঐগুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া বিপক্ষের নিরীহ কর্ম্মচারী রসময় মিত্রের দেহে বিদ্ধ হয় ও মিত্র মহাশয় সংজ্ঞাশূন্য হইয়া ভূপতিত হন। লোকে মনে করিল, তিনি মারা গিয়াছেন। তখনই 'খুন হইয়াছে,' 'খুন হইয়াছে' বলিয়া রব উঠিল। ফলে গ্রেপ্তারের আশঙ্কায় স্বপক্ষ ও বিপক্ষ উভয় পক্ষেরই লাঠিয়াল প্রভৃতি পলায়ন করিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই বিরধীয়স্থল এক প্রকার জনশূন্য হইল। দারোগা তখন মাধবনারায়ণের বিপক্ষ পক্ষীয় দুই তিন জন লোককে গ্রেপ্তার করিলেন ও রসময় মিত্রকে হাসপাতালে পাঠাইলেন।

যে সময়ের ঘটনা, সেই সময়ে পুলিশের অত্যন্ত প্রভাব ও প্রতিপত্তি ছিল। পুলিশই তখন গ্রামের হর্ত্তা-কর্ত্তা বিধাতা ছিল। পুলিশের রিপোর্ট তখন বেদবাক্য বলিয়া হাকিমেরা বিশ্বাস করিতেন। কাজেই পুলিশেরও তখন উৎকোচ গ্রহণের প্রভূত সুবিধা ছিল।

এ ক্ষেত্রেও ইহার অপক্লব ঘটিল না। দারোগা স্থির করিলেন,—রাজকুমার রায় চৌধুরী ও ঈশ্বরচন্দ্র রায় চৌধুরী প্রভৃতির বিরুদ্ধে রিপোট দিবেন। ইহা শুনিয়া তাঁহারা দারোগার নিকটে লোক পাঠাইলেন এবং উৎকোচের বলে যাহাতে তিনি বিপরীত রিপোর্ট দেন সে পক্ষে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দারোগা বলিলেন,—সদর মহকুমা নিকটে; এত বড় ঘটনা চাপিয়া রাখা যাইবে না। তবে কর্ত্তারা যাহাতে বাঁচিয়া যান সেজন্য চেষ্টা করিব। কিন্তু ৫০০০৲ টাকা দিতে হইবে। দারোগার দাবীর পরিমাণ দেখিয়া রাজকুমার রায় চৌধুরী, দুর্গানারায়ণ রায় চৌধুরী ও ঈশ্বরচন্দ্র রায় চৌধুরী-প্রমুখ বিপক্ষ পক্ষের জ্ঞাতিগণ মাধবনারায়ণের নিকটে আসিয়া বলিলেন, আমরা তোমা অপেক্ষা বয়সে জ্যৈষ্ঠ হইলেও তুমি আমাদের জ্যেষ্ঠানুযায়ী বংশধর এবং ধারাবাহিকরূপে বংশের শ্রেষ্ঠ পদের অধিকারী তুমিই। এ অবস্থায় আমাদিগকে কারাগারে পাঠাইলে তোমারই অখ্যাতি হইবে। আমরা যদি কেহ কাহারও বিরুদ্ধে সাক্ষ্য ও প্রমাণ না দিই, কেহ কাহাকেও জব্দ করিবার চেষ্টা না করি, তাহা হইলে দারোগা আমাদের কি করিতে পারিবেন ?'

মাধব নারায়ণ বিপন্ন জ্ঞাতিবর্গের অনুরোধ রক্ষা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি দারোগার নিকটে বলিয়া পাঠাইলেন, ব্যাপারটা যাহাতে মিটিয়া যায় সেইরূপ ব্যবস্থা আপনি করুন। কিন্তু দারোগা তাহাতে অসম্মত হইয়া মাধব নারায়ণ ও তাঁহার জ্ঞাতিবর্গ—উভয় পক্ষের বিরুদ্ধেই গবর্ণমেণ্টকে বাদী করিয়া রিপোর্ট দাখিল করিলেন। ফলে জ্ঞাতিবর্গের সহিত নিরপরাধ মাধবনারায়ণ ও আসামী-শ্রেণীভুক্ত হইলেন। জ্ঞাতিবৃন্দকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য তিনি স্বেচ্ছায় বিপদকে আলিঙ্গন করিলেন। বরিশাল আদালতে এই দাঙ্গা-

মামলা চলিতে লাগিল। বিচারফলে রাজকুমার রায় চৌধুরী ও ঈশ্বরচন্দ্র রায় চৌধুরীর দণ্ডভোগ হইয়াছিল এবং মাধব নারায়ণ ও দুর্গানারায়ণ প্রভৃতি মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন।

মাধবনারায়ণ কিরূপ জনপ্রিয় ছিলেন তাহার প্রমাণ এই মামলায় পাওয়া যায়। বরিশালের আদালতে যখন মাধবনারায়ণের মামলা চলিতেছিল, তখন তাঁহার মামলা শুনিবার জন্য বিপুল জনসমাগম হইত। যে দিন তিনি মুক্তিলাভ করেন সেই দিন এজলাসে এক পাগলিনী উলুধ্বনি এবং সমবেত লোকগণ জয়ধ্বনি করিয়াছিল।

বাঙ্গালা ১২৬৫ সালের ১৩ই কার্ত্তিক সেজ রাজার প্রথম পুত্র গিরীন্দ্রনারায়ণ জন্ম-গ্রহণ করেন। পৌত্র-মুখ অবলোকন করিয়া রাণী অম্বিকা পরম প্রীতিলাভ করিলেন। ধর্ম্মপ্রাণা অম্বিকা পৌত্ররত্ন সন্দর্শনে নিজেকে কৃতকৃতার্থ মনে করিলেন। পতির পরোলোক-প্রাপ্তির পর হইতেই তিনি অন্নত্যাগ করিয়াছিলেন। দিবারাত্র ধর্ম্মকর্ম্মেই তিনি কাল যাপন করিতেন। এই সময়ে তিনি লখাকাঠী হাটে একটি সুবৃহৎ পুষ্করিণী খনন করাইয়া উহার প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ পুষ্করিণীর একটী পাকা ঘাট প্রস্তুত করাইয়া দিলেন; উহাতে উক্ত গ্রামস্থ লোকের জলকষ্ট দূরীভূত হইল। লখাকাঠী পুষ্করিণীর ন্যায় জোলাগাতী প্রভৃতি অন্যান্য গ্রামেও তিনি কয়েকটি দীঘিকা খনন করাইয়া উহাদের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই সকল পুষ্করিণী এবং দীর্ঘিকা এখনও বর্ত্তমান থাকিয়া অতীতের সেই স্মৃতি রক্ষা করিতেছে। তাঁহার নিজ সম্পত্তির আয় হইতে অনেক অর্থ গুরু, পুরোহিত ও নিঃস্ব ব্রাহ্মণদিগকে দান করিতেন। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের যজ্ঞোপবীত ও পরিণয় উপলক্ষে তিনি প্রভূত অর্থ প্রদান করিতেন। অনেক দাস-দাসী থাকা সত্ত্বেও এই ধর্ম্মনিষ্ঠা মহীয়সী নারী

প্রত্যহ স্বহস্তে পূজার উপকরণ লইয়া শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী মাতার মন্দিরে যাইতেন এবং তথায় পূজা ও আরাধনায় অনেক সময় অতিবাহিত করিতেন। রামায়ণ ও পুরাণাদি শ্রবণে দিবসের পঞ্চম বেলা পর্য্যন্ত কাটাইয়া শাস্ত্রানুমত ষষ্ঠ বেলায় ব্রহ্মচারিণীর আহার্য্য গ্রহণ করিতেন। রাত্রিকালেও এইরূপ দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত সন্ধ্যা-আহ্নিক ও ধর্ম্মকথা শ্রবণে অতিবাহিত করিয়া কিঞ্চিৎ দুগ্ধপান-পূর্ব্বক শয়ন করিতেন। আবার এদিকে রাত্রির চতুর্থ যামেই তিনি শয্যা ত্যাগ করিয়া আহ্নিক ইত্যাদিতে রত হইতেন। ইহার কিছু দিন পরে তিনি একদিন প্রাতঃকালে পুত্র, পুত্রবধূ, আত্মীয়-স্বজন এবং কর্ম্মচারী সকলকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, তিনি সিদ্ধেশ্বরী দেবীর আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন যে, শীঘ্রই তাঁহাকে পতিলোকে গমন করিতে হইবে। অতএব সেই রাত্রিতেই তিনি ৺কাশীধাম যাত্রা করিবেন। এই বলিয়া তাঁহার নিজের যে সমুদয় অলঙ্কার ছিল, তাহা পুত্রবধূদ্বয়কে অর্পণ করিয়া তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, আমার দেহান্তে আমার নিজ বিষয়-সম্পত্তি যাহা কিছু আছে তাহা তোমরা তুল্য অংশে বিভাগ করিয়া লইবে। জননীর এতাদৃশ অদ্ভুত অলৌকিক বাক্য শুনিয়া উপস্থিত সকলেই স্তম্ভিত হইলেন। কিন্তু মাতৃভক্ত পুত্রদ্বয় তাঁহার বাক্যে কোনরূপ অবিশ্বাস করিলেন না। তাঁহারা তখন ইষ্টমন্ত্রদাতা গুরুদেব, মাধব নারায়ণের দেওয়ান শ্রীশ্রীনাথ সিংহ-রায়, মোক্তার শ্রীকমলাকান্ত বসু ও কয়েকজন পরিচারক ও পরিচারিকা সহ জননীকে কাশীধামে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন। হরসুন্দরী ও মাতার সঙ্গে কাশী যাত্রা করিলেন।

তখন বারাণসী যাইবার রেলপথ হয় নাই, নৌকাতেই যাইতে হইত। রাণী অম্বিকা প্রথমে শ্রীশ্রীকালীক্ষেত্র (কালীঘাট) গমন

পূর্ব্বক সেখানে কালীমাতাকে দর্শন করিয়া, তীর্থ-শ্রাদ্ধ, ব্রাহ্মণভোজন এবং আনুসঙ্গিক নানারূপ দানাদি করিয়া তথা হইতে কাশী রওনা হইলেন। পথিমধ্যে গয়াক্ষেত্র প্রাপ্ত হইয়া গুরুদেবের অনুরোধে তথায় ষোড়শাদি তীর্থকৃত্য এবং ব্রাহ্মণভোজন করাইলেন। এই সঙ্গে তাঁহার সহগামী লোক দিগের গয়ার সমুদয় কার্য্য সমাপন করিবার অর্থ প্রদান করিলেন। গয়া হইতে ক্রমে তিনি কাশীধামে পৌছিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া কাশীখণ্ড শ্রবণ করিয়া উহার উদ্‌যাপন করিলেন। এবং অর্দ্ধ প্রসূতা ধেনু ও তুলা দান এবং কাশীধামস্থ ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিত-মণ্ডলীকে দশ টাকা হারে বিদায় প্রদান করিলেন।

ইহার অল্প কয়েক দিবস পরে তাঁহার সামান্য জ্বর হইল; পর দিবস তিনি তাঁহার সঙ্গী লোকদিগকে ডাকিয়া বলিলেন "আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি, আমাদের কুলদেবী শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী কালীমাতা আমার নিকটে আসিয়া আমাকে বলিতেছেন, বিশ্বেশ্বর কল্যই তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন। অতএব আমাকে অবিলম্বে মণিকর্ণিকার ঘাটে লইয়া চল।"

সঙ্গী লোকেরা তাঁহাকে দেবী বলিয়া মনে করিতেন। সুতরাং তাঁহার কথায় আর কেহ কোনরূপ দ্বিধা না করিয়া তাঁহাকে লইয়া মণি-কর্ণিকার ঘাটে গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া তিনি ৫০০৲ পাঁচ শত টাকার চাউল, টাকা, সিকি ও দুয়ানি কাঙ্গালীদিগকে বিতরণ করিলেন। অতঃপর কাশীনাথ নামক যাত্রাওয়ালা, গঙ্গাপুত্রগণ, গুরুদেব এবং দেশীয় যে সকল ব্রাহ্মণ তথায় উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদিগকে নিজ বিষয় হইতে কিছু কিছু ভূমি দান করিলেন এবং দক্ষিণা-স্বরূপ প্রত্যেককে এক একখানি মোহর দিলেন। তিনি স্বয়ং তথায় গমন-পূর্ব্বক শয়িত হইয়া ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে করিতে গুরুদেবের চরণতলে মস্তক রাখিয়া মানবলীলা সংবরণ করিলেন।

১৭৮২ শকাব্দে (বাঙ্গালা ১২৬৭ সাল) জ্যৈষ্ঠ মাসে কৃষ্ণা অষ্টমী তিথিতে জগদম্বা-রূপিণী জননী অম্বিকা লীলাক্ষেত্র ভবধামপ রিত্যাগ করিয়া নিত্যানন্দ শিবধামে প্রস্থান করিলেন। উপস্থিত জনবৃন্দ জননীর স্বজ্ঞানে স্বর্গপ্রাপ্তি সন্দর্শন করিয়া সানন্দে শিব নাম করিতে করিতে আপনাদিগকে কৃতকৃতার্থ মনে ক'রতে লাগিল।

দেওয়ান শ্রীনাথ সিংহ রায় মহাশয় (অপর নাম হরিচরণ রায়) এই সংবাদ রায়ের কাঠীতে সেজ রাজা ও ছোট রাজার নিকটে প্রেরণ করিলেন। রাণী অম্বিকা চৌধুরাণীর মৃত্যুর তিন চারি মাস পরে শ্রীনাথ সিংহরায় মহাশয়ও কাশীধামে ইহলীলা সংবরণ করেন। অতঃপর হরসুন্দরী তদীয়া সঙ্গিগণ সহ রায়ের কাঠীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

মাতৃবিয়োগে মাধবনারায়ণ ও নরনারায়ণ উভয়েই সবিশেষ শোকাকুল হইয়াছিলেন। কিন্তু শোকের প্রাবল্য চিরদিন থাকে না; ক্রমে উহা হ্রাস প্রাপ্ত হয়। ইহাই বিধাতার বিধান। সুতরাং ইহাঁদেরও শোকাবেগ কমিয়া আসিল এবং যথাসময়ে ইহাঁরা স্বর্গগতা জননীর শ্রাদ্ধকার্য্য সুসম্পন্ন করিলেন। শ্রাদ্ধে রূপার ষোড়শ, একোদ্দিষ্ট, বৃষোৎসর্গ, ব্রাহ্মণ-দম্পতী পূজা, মচলন্দ প্রভৃতি এবং গো-দান, অশ্ব-দান, পাল্কী দান, শালগ্রাম-শিলা দান, নৌকা দান ইত্যাদি কোন অনুষ্ঠানই বাদ যায় নাই। শ্রাদ্ধোপলক্ষে কাশী, দ্রাবিড়, নবদ্বীপ, বিক্রমপুর সোদ্ধারকূল, বাকলা, বাঙ্গড়া, সাহাজাদপুর প্রভৃতি স্থানের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ নিমন্ত্রিত হইয়া রায়ের কাঠীতে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের যথাযোগ্য পাথেয় ও ভোজ্য ইত্যাদি এবং প্রত্যেককে ১৬৲ টাকা হারে 'বিদায়' দেওয়া হইয়াছিল। দেশ-বিদেশের বহু ভদ্রলোক নিমন্ত্রিত হইয়া রায়ের কাঠীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণগণ,

ব্রাহ্মণগণ, জাতি-নির্ব্বিশেষে নিমন্ত্রিত বহুলোক ও কাঙ্গালিগণ সকলেই ভূরি ভোজনে পরিতৃপ্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই একবাক্যে পুনঃ পুনঃ প্রশংসা করিয়া বলিয়া গিয়াছিলেন যে, এরূপ বিপুল আয়োজন এবং বিরাট অনুষ্ঠান তাঁহারা অতি অল্প শ্রাদ্ধেই দেখিয়াছেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

পূর্ব্ববর্ত্তী সদর ও মফস্বলের কর্ম্মচারীদের মধ্যে প্রায় অনেকেরই পরলোক প্রাপ্তি হইল। কেবলমাত্র জলাবাড়ী নিবাসী মদনমোহন বিশ্বাস ও তদীয় ভ্রাতা জগমোহন বিশ্বাস এবং রায়েরকাঠীর পূর্ব্বপাড়া-নিবাসি ব্রাহ্মণ আনন্দচন্দ্র রায়, মৃধাদিগের (বরকন্দাজ) মধ্যে বড়খলিশাখালি নিবাসী আহাম্মদালী তালুকদার ও কুমারখালি নিবাসী আর্ব্বাচ কাজী * এবং মফস্বলস্থ কর্ম্মচারীদের মধ্যে চিঙ্‌ড়াখালী নিবাসী রামজীবন দে জীবিত রহিল। † ইহারা আজীবন নিজপ্রভুর কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। এই সময় সেজরাজার সদর ও মফঃস্বলের কতকগুলি কর্ম্মচারী এবং মৃধা রাখিবার আবশ্যক হইল। তাহাতে সেজরাজা রায়েরকাঠীর তাঁহাদের দেওয়ান বংশ হইতে কৃষ্ণকান্ত রায়কে দেওয়ান পদে নিযুক্ত করিলেন। অল্পদিন পরেই কৃষ্ণকান্ত রায়ের মৃত্যু হইলে তাহার স্থলে ঐ বংশের কাশীশ্বর রায়কে নিযুক্ত করেন। ‡

---

* ইহার পৌত্র শাতু ও এচ্‌মাইল কাজি প্রভৃতি এখন বর্ত্তমান আছে।

† রামজীবনদে চিঙ্‌ড়াখালি মহলে নায়েব ছিলেন। তাহার পুত্র গোবিন্দচন্দ্র দে ও তাহার পৌত্র প্রকাশচন্দ্র দে ইহারা সকলেই বিশ্বাসী ভাবে কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। রামজীবনের প্রপৌত্র প্রফুল্লচন্দ্র দে প্রভৃতি বর্ত্তমান আছে। ইহারা সকলেই বিশ্বাসী এবং প্রভুভক্ত। মাধবনারায়ণের মৃত্যুর পর তাঁহার স্ত্রী শ্রীযুক্তা জগৎমোহিনী চৌধুরাণীর ষ্টেটে ও তাহার পুত্র শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরীর ষ্টেটে গোবিন্দচন্দ্র দে হইতে ইহারা বিশ্বাসী ভাবে কার্য্য করিয়াছে এবং করিতেছে। এই ষ্টেটে কার্য্য করিয়াই ইহাদের উন্নতি হইয়াছে।

‡ কাশীশ্বর রায়ের পুত্র শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার রায় ও সতীসচন্দ্র রায় জীবিত আছেন।

নবকান্ত মিত্র, ব্রাহ্মণ দুর্গাবর রায়, মথুরানাথ বসু, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী অধিকারী, ফকিরচাঁদ ঘোষ, দ্বারিকানাথ রায়, হরমোহন দাস, ব্রজনাথ সিকদার, রাজকিশোর সিকদার, ভোলানাথ বিশ্বাস প্রভৃতিকে সদর ও মফস্বলের কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিলেন। বরিশালের মামলা, মোকদ্দমা চালাইবার জন্য বৈকুণ্ঠনাথ সমদ্দারকে মোক্তার এবং খ্যাতনামা উকিল দুর্গামোহন দাসকে ষ্টেটের উকিল পদে নিযুক্ত করেন। পিরোজপুরে গুরুচরণ দাসকে মোক্তার ও বিখ্যাত উকিল ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যাকে ষ্টেটের উকিলের পদে নিযুক্ত করেন। গড়ঘাটা নিবাসী কোমর সর্দ্দার এবং জোলাগাতী নিবাসী জরাপ খাঁ, তরাপ খাঁ, মুনিরদ্দি খোন্দকার ও রায়েরকাঠী নিবাসী সমস খাঁ, খোসাল মিরা আর্জ্জান উল্লা প্রভৃতি অনেককে মৃধার কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন।

দুর্গামোহন বাবু বরিশাল হইতে কলিকাতায় চলিয়া আসিলে তখনকার বরিশালের শ্রেষ্ঠ উকিল পিয়ারীলাল রায় মহাশয় উকিল পদে নিযুক্ত হন। তৎপর মৌলবী ওয়াজেদ মিঞাঁকে উকিল পদে নিযুক্ত করেন। ওয়াজেদ মিঞাঁ গভর্ণমেণ্টের উকিল ছিলেন। তিনি অতি চরিত্রবান্ ও ধার্ম্মিক লোক, তিনি মাধবনারায়ণকে জ্যেষ্ঠভ্রাতার ন্যায় ভক্তি করিতেন। মাধবনারায়ণের মৃত্যুর পরতে তিনি গিরীন্দ্রনারায়ণ ও নগেন্দ্রনারায়ণ প্রভৃতির ষ্টেটেও ওকালতির কার্য্য করিতেন। মাধব-নারায়ণের মৃত্যুর পর যখন গিরীন্দ্রনারায়ণ ও শ্রীযুক্তা জগৎমোহিনী চৌধুরানীর আত্মকলহ উপস্থিত হইয়া ষ্টেটটী ধ্বংশ হইবার উপক্রম হয় তখন শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরীর বিশেষ চেষ্টায় ও উক্ত ওয়াজেদ মিঞাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমেই মীমাংসা কার্য্য সুসম্পন্ন হয়। এই ওয়াজেদ মিঞাঁর পুত্রই হাইকোর্টের খ্যাতনামা উকিল ও কাউন্সেলের মিনিষ্টার কজলাল হক্।

আহাম্মদালীর পিতামহ সোণা উল্লা মাধবনারায়ণের প্রপিতামহ শিবনারায়ণের জমাদার ছিল। শিব নারায়ণের চাকরী করিয়াই তাহার সৌভাগ্যের সূচনা হয় এবং এই সময় হইতেই তাহাদের জমাদার উপাধি হয়। সেই সময় হইতেই তাহাদের বাটীকে জমাদার বাটী বলা হইয়া থাকে। * আহাম্মদালীর পুত্রই আবি আবদুল্লা। আহাম্মদালীর সময় হইতেই উহাদের তালুক জমাজমী অনেক বৃদ্ধি হয়। আবি আবদুল্লার পুত্র এখন পিরোজপুরে অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিতেছেন। আবি আবদুল্লা এখন জমিদারী ও অনেক খারিজা তালুক খরিদ করিয়া বেশ অবস্থাপন্ন হইয়াছেন। আহাম্মদালীর মৃত্যুর পর আবি আবদুল্লা মাধবনারায়ণের পুত্র শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনারায়ণ, যতীন্দ্র নারায়ণ, জীবেন্দ্রনারায়ণ এবং সুরেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরীর ষ্টেটে পৈতৃক মৃধার (বরকন্দাজ) কার্য্য করিত, কিন্তু নিজে আসিত না। তাহার প্রতিনিধি স্বরূপ মেহেরালী মৃধা নামক জনৈক লোককে রাখিয়া দিয়াছিল এবং পৈতৃক বেতনের টাকা গ্রহণ করিত। সে বলিত ইহাই আমাদের ভাগ্যলক্ষ্মী।

---

* সেজ রাজার সময় আহম্মদালী নিজে সর্ব্বদা আসিত না তাহার পক্ষের লোক থাকিত, আবশ্যক মত লাঠিয়াল ও জিনিষপত্র সরবরাহ করিত এবং বিশেষ আবশ্যক হইলে নিজে আসিত; তাহার পিতা এবং পিতামহ শিবনারায়ণ ও মহেন্দ্রনারায়ণের নিকট সর্ব্বদা আসিয়া কার্য্য করিত। মৃধা দুই রকম; এক রকম লাঠিয়ালের কার্য্য করে এবং অবাধ্য প্রজাকে ধরিয়া আনে ও প্রজার খাজনা আদায় করে। অবাধ্য প্রজা শাসন তাহাদের দ্বারাই হয়। অন্যরকম নিজেরা লাঠীয়ালের কার্য্য করে না, লাঠীয়াল সরবরাহ করে এবং আবশ্যক মতন বিবাদ মীমাংসা করে, আবশ্যকীয় জিনিষপত্র সরবরাহ করে। শোনাউল্লা হইতে আবিআবদুল্লার প্রথম সময় পর্য্যন্ত তাহারা শেষোক্ত মৃধার কার্য্য করিত।

রাণী অম্বিকা চৌধুরাণীর শ্রাদ্ধের কিছুদিন পরেই মাধবনারায়ণের একটি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে। তাঁহার পত্নী শ্রীমতী কামিনী চৌধুরাণী প্রসবান্তে রোগাক্রান্তা হইলেন এবং অল্পদিন রোগ-ভোগের পর ইহলোক হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন। পত্নীবিয়োগে মাধবনারায়ণ অতিশয় কাতর হইয়া পড়িলেও এই দারুণ শোক তিনি নীরবে সহ্য করিলেন। বাহিরে কোনওরূপ উদ্বেগ বা চাঞ্চল্য তিনি প্রকাশ করিলেন না এবং শোকে কর্ত্তব্য ভ্রষ্ট হইলেন না। পত্নীর চন্দনধেনু সম্পাদন করতঃ পুত্রের দ্বারা যথাবিহিত শ্রাদ্ধকার্য্য সুসম্পন্ন করিলেন। পত্নীশোক শেলবিদ্ধ মাধবনারায়ণ অসাধারণ সহিষ্ণুতার সহিত বৈষয়িক কর্ম্মগুলি পত্নী বিদ্যমান থাকিতেও যেরূপ ভাবে সম্পন্ন করিতেন, পত্নীর মৃত্যুর পরেও ঠিক সেই ভাবেই সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। কিন্তু গৃহলক্ষ্মীর অভাবে গৃহকর্ম্মে বিশৃঙ্খলা ঘটিতে লাগিল। নবপ্রসূতা কন্যাও শিশুপুত্রের লালনপালন রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। মাধবনারায়ণ ভগবানে নির্ভরশীল ও ধৈর্য্যশীল পুরুষ ছিলেন; তিনি নিজের ক্লেশ অম্লানবদনে সহ্য করিতে পারিতেন। কিন্তু বিধাতা যাহাদের ভার তাঁহার উপরে ন্যাস্ত করিয়াছেন তাহাদের বিন্দুমাত্র কষ্টের সম্ভাবনা দেখিলেই তিনি তদ্দণ্ডেই উহার প্রতিবিধানে ব্রতী হইতেন। সদ্য মাতৃহীনা কন্যাকে স্তন্য দুগ্ধ পান না করাইলে তাহার জীবন রক্ষা দুষ্কর বিবেচনা করিয়া তিনি বহু অন্বেষণে একটি দুগ্ধবতী দরিদ্র গৃহস্থ বধূকে স্তন্য দানের জন্য নিযুক্ত করিলেন; এবং কন্যা ও পুত্রের রক্ষণাবেক্ষণের ভার মাধব-নারায়ণের নিজ ধাত্রী অভয়া দাসীর উপর অর্পণ করিলেন। কিন্তু এত চেষ্টা করিয়াও মাধবনারায়ণ কন্যাটিকে রক্ষা করিতে পারিলেন না, কিছুকাল পরে সে তাহার মাতার অনুগমন করিল।

অভয়া দাসী ধাত্রী হইলেও ইহার সম্বন্ধে কিছু বিবরণ প্রদান করা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। তিনি মাধবনারায়ণ ও তাহার পুত্র গিরীন্দ্রনারায়ণ উভয়কেই লালনপালন করেন। তিনি মহেন্দ্রনারায়ণের সময় হইতেই এই বাড়ীতে কাজ করিয়া অনেক টাকা উপার্জ্জন করিয়া ছিলেন। সেই টাকার কিয়দংশ দ্বারা তিনি কিছু ভূসম্পত্তি খরিদ করেন। মাধবনারায়ণ তাঁহার এই ধাত্রীকে বহু দুর্গম তীর্থাদি পর্য্যটন করাইয়া আনিয়াছিলেন। অভয়া তীর্থাদি ভ্রমণান্তে ১৭৭৬ শকাব্দে বা ১২৬১ সালে রায়েরকাঠীর কালীবাড়ীতে একটি ইষ্টক নির্ম্মিত মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া উহাতে শিব প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময়ে মাধবনারায়ণও এক শিব-প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেই শিবও ঐ মন্দির-মধ্যে স্থাপিত হয়। শিব-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে অভয়া সুন্দরী একাগ্নি যজ্ঞ সম্পন্ন করেন। এতদুপলক্ষে সোন্ধারকূল পরগণাস্থ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মণ্ডলী ও দেশস্থ নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ, ভট্ট ও রাঘব প্রভৃতিকে প্রচুর অর্থদানে ও ভোজনে পরিতুষ্ট করেন। তখনকার পরিচারিকারাও যে সকল সৎকার্য্য করিতেন, এখনকার উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণের ভার্য্যারাও তাহা করেন না। তখনকার লোকের তীর্থাদিতে যেরূপ আস্থা ছিল এখনকার লোকের সেরূপ আস্থা নাই। এখনকার দিনে মা ভগিনীগণ বস্ত্রালঙ্কার ও সাজ-সজ্জা লইয়াই ব্যস্ত; যদি ক্বচিৎ তাঁহারা কোনও তীর্থস্থানে গমন করেন তাহা হইলে তাহা তীর্থ করিবার উদ্দেশ্য নয়—বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য।

বুদ্ধিমন্ত ঘোষও মাধবনারায়ণকে ছেলেবেলায় প্রতিপালন করিয়া-ছিল। * রায়েরকাঠীর পশ্চিম পাড়ায় উহার বাড়ী ছিল, এই

* বুদ্ধিমন্ত মহেন্দ্রনারায়ণের আমোলের ভৃত্য। তাঁহার সময় হইতেই এই বাড়ীতে কার্য্য করিত ইহার পৌত্র পূর্ণচন্দ্র ঘোষ এখন বর্ত্তমান আছে।

বাড়ীতে অভয়া দাসী এক পুষ্করিণী খনন ও প্রতিষ্ঠা করেন। এই পুষ্করিণী দ্বারা সেই বাটীর ও পার্শ্ববর্ত্তী বহুলোকের জলকষ্ট দূরীভূত হয়। অভয়া দাসী বেবাগ্দীর খ্যাতনামা বিশ্বেশ্বর কথক চূড়ামণি ও কোটালিপাড়া নিবাসী প্রধান বৈয়াকরণিক বিশ্বেশ্বর তর্কপঞ্চাননকে কথক ও পাঠক নিযুক্ত করিয়া রামায়ণ শ্রবণ করেন। এইরূপে অভয়া দাসী ব্রত, পার্ব্বণাদি ধর্ম্ম কার্য্যে ও নানাবিধ সদনুষ্ঠানে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া যান। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দির ও পশ্চিম পাড়াস্থিত সেই পুষ্করিণী তাঁহার পুণ্যকীর্ত্তির নিদর্শন স্বরূপ অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। অভয়া দাসী মৃত্যুকালে তাহার অবশিষ্ট ধন সম্পত্তি গিরীন্দ্র নারায়ণকে দান করিয়া গিয়াছেন।

মাধবনারায়ণের স্ত্রী ও নবজাত কন্যার মৃত্যুর পর কিছুদিন অতিবাহিত হইলে মাধবনারায়ণের আত্মীয়বর্গ তাঁহাকে পুনরায় দার পরিগ্রহ করিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তিনি প্রথমে তাঁহাদের অনুরোধ পালনে অক্ষমতা জ্ঞাপন করেন, কিন্তু যখন তাঁহারা সকলেই বুঝাইতে লাগিলেন যে, তিনি দার-পরিগ্রহ না করিলে গৃহ-কর্ম্মে অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা ঘটিবে ও সেজন্য সংসারে অশান্তিও ঘটিবে, তখন মাধবনারায়ণ ভাবিয়া দেখিলেন যে, তাহাদের কথা অতিশয়োক্তি নহে। অবশেষে পুনরায় দার পরিগ্রহে তিনি সম্মতি দিলেন।

বিবাহ ব্যাপারে মাধবনারায়ণের পারিবারিক প্রথা পূর্ব্ব হইতে এইরূপ চলিয়া আসিতেছিল যে, ছেলেরই বিবাহ হউক বা মেয়েরই বিবাহ হউক তাঁহারা কাহারও বাড়ীতে গিয়া বিবাহ করিতেন না। অপর পক্ষ তাঁহাদের বাড়ীতে আসিয়া বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করাইতেন। কুলীনগণও ইহাতে অসম্মত হইতেন না বা কোনওরূপ অসুযোগ প্রকাশ অথবা অপমান বোধ করিতেন না, কারণ তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষ কিঙ্কর

সেন * যখন একযায়ী করেন তখন কুলীনগণ তাঁহাকে সৎক্রিয়ান্বিত ও কুলীন প্রতিপালক জানিয়া এবং তাঁহার বিনয় ও নম্রতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে এই সম্মান প্রদান করিলেন যে—"পাত্রপক্ষ পাত্রীর বাটী যাইয়া বিবাহ দেওয়ার নিয়ম প্রচলন আছে; এখন হইতে পাত্রীপক্ষ পাত্রী সহ আপনার কি আপনার বংশধরের বাটী যাইয়া বিবাহ দিতে কোন কুলীনই অসম্মত হইবেন না।" তদবধি কুলীনগণ পাত্র কি পাত্রী সহ ইঁহাদের বাটী আসিয়া বিবাহ দিতেছেন। ইহারা দক্ষিণ রাঢ়ীয় মৌলিক কায়স্থ দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মৌলিক ও সম্মানীয় বংশ, মাধবনারায়ণের পূর্ব্বপুরুষগণ নানাস্থানের নানা শ্রেণীর কুলীন কায়স্থগণকে বহু নিষ্কর ভূমি দান করিয়াছিলেন। এবং অনেককে অনেক ভূসম্পত্তি দিয়া সগ্রামে বাস করাইয়া ছিলেন। †

রায়েরকাঠীর পূর্ব্বপাড়া নিবাসী ব্রাহ্মণ দুর্গাবর রায় মাধবনারায়ণের কর্ম্মচারী ছিলেন। ‡ তিনি মাধবনারায়ণের জন্য পাত্রী অনুসন্ধানে ব্রতী হইলেন। মাধবনারায়ণের বিবাহ যে সে ঘরে হইতে পারে না; এই জন্য পাত্রী অনুসন্ধানের ভার এই বিচক্ষণ ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারীর উপরই

---

* এই একযায়ীতে কিঙ্কর গোষ্ঠীপতিত্ত লাভ করিয়াছিলেন। কিঙ্কর দিল্লীর বাদসাহ-কর্ত্তৃক ভূঞিয়া ও রায় উপাধি প্রাপ্ত হন।

† কুলীন কায়স্থ ব্যতীত ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য জাতীয় লোকদিগকেও অনেক নিষ্কর জমি দান করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের বংশধরেরা এখনও উহা সুখস্বচ্ছন্দে ভোগ করিতেছেন।

‡ দুর্গাবর রায় সদালাপী ও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি চিরকুমার ছিলেন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ রায় এখনও মাধবনারায়ণের কনিষ্ঠ পৌত্র শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্রনারায়ণের কর্ম্মচারী পদে নিযুক্ত আছেন।

ন্যস্ত হইয়াছিল। দুর্গাবর রায় ইতস্ততঃ পাত্রীর সন্ধান করিতে করিতে জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত পানিহাটী গ্রামে কোমল মুখ্য কুলীন কালীকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়ের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সর্ব্বসুলক্ষণা তৃতীয়া কন্যা শ্রীমতী জগৎমোহিনীর সহিত মাধবনারায়ণের বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিলেন। কালীকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয় পূর্ব্বে কলিকাতার রেলিব্রাদার্স কোম্পানীর মুৎসুদ্দি ছিলেন। তাঁহার বিষয় সম্পত্তিও যথেষ্ট ছিল। তিনি সবিশেষ উদার প্রকৃতি ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আশুতোষ দেব মহাশয় (সাতু বাবু) এই কালীকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়ের ভগিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তখনকার দিনে সাতুবাবুর নাম কেবল কলিকাতায় কেন বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র সুপরিচিত ছিল।

মাধবনারায়ণের বিবাহ তাঁহাদের পারিবারিক প্রথানুযায়ী রায়ের-কাঠীতে মাধবনারায়ণের পিশীমা দুর্গামণির বাড়ীতে ১৭৮২ শকাব্দে (বাঙ্গলা ১২৬৭ সাল) ফাল্গুন মাসে নিষ্পন্ন হয়। দুর্গামণি জগৎ-মোহিনীকে তাঁহার বাটীর সংলগ্ন দক্ষিণ দিকে একখণ্ড জমি যৌতুক স্বরূপ দান করেন। * কালীকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয় তদীয় কন্যাকে লইয়া রায়েরকঠীতে আগমন করিয়া শুভ বিবাহ সম্পন্ন করেন। এই বিবাহে ঘোষ মহাশয় বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। তিনি মাধব-নারায়ণকে যৌতুক স্বরূপ প্রভূত স্বর্ণ রৌপ্য, বহুমূল্য বরাভরণ ও বর-সজ্জা এবং কন্যা জগৎমোহিনীকেও স্বর্ণরৌপ্যের বহু অলঙ্কার প্রদান

* এই জমিখণ্ডে মাধবনারায়ণ একখানি মনোরম বাগান প্রস্তুত করিয়াছিলেন এখন আর বাগানের সে শোভা নাই তবুও পূর্ব্ব বিটপী ও বসিবার বাঁধান স্থানগুলির কতক বর্ত্তমান থাকিয়া অতীতের স্মৃতি উদয় করিয়া দিতেছে।

করিয়াছিলেন। মাধবনারায়ণও কন্যাযাত্রী দিগের কুলমর্য্যদা ও যাতায়াতের ব্যায় ইত্যাদিতে অনেক টাকা খরচ করেন।

শ্রীযুক্তা দুর্গামণি প্রাণনারায়ণের কন্যা এবং মহেন্দ্রনারায়ণের ভগিনী। প্রাণনারায়ণ তাঁহার এই কন্যাকে রায়েরকাঠীতে বসতিবাটী এবং ইন্দুর কানি, ধরা ধোয়া প্রভৃতি গ্রামে বিস্তর ভূসম্পত্তি দান করিয়াছিলেন। দুর্গামণি নিঃসন্তান ছিলেন। তাঁহার ঐ সকল সম্পত্তি যশোহর জেলার অন্তর্গত ইত্না গ্রাম নিবাসি শ্রীযুক্ত বঙ্কুবিহারী ঘোষ ও প্রকাশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি ওয়ারিশ ক্রমে ভোগদখল করিতেন। * এক্ষণে ঐসকল সম্পত্তি চারুচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি ভোগ করিতেছেন।

বিবাহের এক বৎসর পরে মাধবনারায়ণ তাঁহার শ্বশুর মহাশয়ের সবিশেষ অনুরোধে নৌকাযোগে পাণিহাটিতে গমন করেন। তিনি দুর্গাবর রায় এবং দ্বারবান্, চাকর, ঝি, প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়াছিলেন। তিনি শশুর বাটীতে আসিলে তাঁহার শ্বশুর কালীবাবু ও কালীবাবুর জ্যেষ্ঠতাতভ্রাতা রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের জামাতা শ্রীনাথ ঘোষ মহাশয় এবং অন্যান্য ভদ্রলোক তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। তিনি পাণিহাটির প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে একটী করিয়া টাকা প্রণামী ও একথালা সন্দেশ দিয়াছিলেন। কেবল প্রণামী দিতেই তাহার ৫০০৲ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। শ্বশুর শ্বাশুড়ীর আগ্রহাতিসহে তিনি ১০ দিন পাণিহাটী গ্রামে অবস্থান করিয়াছিলেন। স্ত্রীকে লইয়া রায়েরকাঠী রওনা হইবার সময়ে শ্বশুর বাটীর দ্বারবান ভৃত্য প্রভৃতিকে পুরস্কার দিতেও ক্রুটী করিলেন না।

* শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র ঘোষ মাধবনারায়ণের জামাতা।

কথায় বলে,—"স্ত্রীভাগ্যে ধন"। মাধবনারায়ণের পক্ষে এক্ষণে এই প্রবাদ বচন অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়া গেল। জগৎমোহিনীর সহিত বিবাহের পূর্ব্বে পিতৃঋণ ও গৃহবিবাদ হেতু তাঁহার অবস্থা বড়ই অস্বচ্ছল ছিল; কিন্তু তাঁহার সহিত বিবাহ হইবার পর হইতেই মাধবনারায়ণের অবস্থার উত্তরোত্তর উন্নতি হইতে লাগিল। তাঁহার শ্রীবৃদ্ধির সূত্রপাত হইল। তাঁহার যে সকল সম্পত্তি নিলাম হইয়াছিল সে গুলির কতক কতক তিনি ক্রেতাদিগের নিকট হইতে পুনরায় ক্রয় করিয়া লইলেন। তিন চারি জন ব্যতীত অপর সকল মহাজনই তাঁহাদের পাওনা টাকার কিস্তীবন্দী করিলেন। তিনি জায়গা জমির জরিপ করাইলেন; ফলে তাঁহার আয় বৃদ্ধিও হইল।

সেজরাজা তন্ত্রশাস্ত্রের বড়ই অনুরাগী ছিলেন এবং উহার অনুশীলন করিতে ভাল বাসিতেন। চলিশা গ্রামনিবাসী শিবচন্দ্র তর্কালঙ্কার মহাশয় তাঁহার সভায় তন্ত্রের প্রধান পণ্ডিত ছিলেন। যশোহর জেলার চাঁচড়া-গ্রাম-নিবাসী সুবিখ্যাত তন্ত্রশাস্ত্র বিশারদ ও ধার্ম্মিক রাজা বরদাকান্ত তন্ত্রশাস্ত্রের আলোচনার জন্য মাধবনারায়ণের বাটীতে উপস্থিত হ'ন। তিনি রাজা বরদাকান্তকে সাদর অভ্যর্থনায় সম্বর্দ্ধিত করেন। কয়েকদিন তিনি মাধবনারায়ণের বাটীতে অবস্থান করিয়া তন্ত্রশাস্ত্রের আলোচনা করেন এবং প্রত্যাবর্ত্তনের সময়ে শিবচন্দ্র তর্কালঙ্কার মহাশয়কে সঙ্গে করিয়া লইয়া যান। তাঁহাকে কিছুদিন আপনার নিকটে রাখিয়া রাজা বরদাকান্ত তাঁহার নিকট হইতে তন্ত্রশাস্ত্রের বহু নিগূঢ় তত্ত্ব শিক্ষা করেন। তৎপরে তিনি তর্কালঙ্কার মহাশয়কে নানাবিধ পারিতোষিক প্রদান পূর্ব্বক রায়েরকাঠীতে পাঠাইয়া দেন। প্রবাদ আছে,—তর্কালঙ্কার মহাশয় যখন রায়েরকাঠীস্থ ঠাকুর বাড়ীর শ্মশান-কালী পূজা করেন সেই সময়ে তিনি দেবীর আবির্ভাব অনুভব

করেন। পর দিবসই তিনি মাধবনারায়ণকেও তাঁহার অন্যান্য আত্মীয়-গণকে বলেন, "মা আমাকে অনুগ্রহ করিয়াছেন, সত্বর আমাকে ইহজগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হইবে, আপনারা আমাকে গঙ্গার তীরে পাঠাইয়া দিন।" তাঁহার কথানুসারে মাধবনারয়ণ তর্কালঙ্কার মহাশয়ের ভাগিনেয় দুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়কে সঙ্গে দিয়া তাঁহাকে কলিকাতা কালীঘাটে পাঠাইয়া দিলেন। তখন রায়েরকাঠী হইতে কলিকায় যাইতে হইলে নৌকাযোগে যাইতে হইত এবং ৬।৭ দিনের পূর্ব্বে কলিকাতায় পৌছিতে পারা যাইত না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কালীঘাটে পহুছিবার পরদিবসই তর্কালঙ্কার মহাশয়ের সজ্ঞানে গঙ্গাপ্রাপ্তি হয়।

দুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তন্ত্রশাস্ত্রে সুপণ্ডিত না হইলেও তন্ত্রোক্ত বিধানমতে ক্রিয়াদি করিতে পরাদর্শী ছিলেন। তিনি শান্তি-স্বস্ত্যয়নাদি করিয়া প্রত্যক্ষ ফল দেখাইতে পারিতেন। অতঃপর মাধবনারায়ণ তাঁহাকেই তান্ত্রিক পণ্ডিতপদে নিযুক্ত করিলেন।

কালক্রমে জগৎমোহিনীর গর্ভে মাধবনারায়ণের একটী কন্যা ও পাঁচটী পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করেন; তন্মধ্যে একটী শৈশবেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অবশিষ্ট কন্যা ও পুত্রগণের নাম যথাক্রমে—মানদাসুন্দরী, নগেন্দ্রনারায়ণ, যতীন্দ্রনায়ণ, জীবেন্দ্রনারায়ণ ও সুরেন্দ্রনারায়ণ। ইঁহাদের মধ্যে নগেন্দ্রনারায়ণের নাম দেশ-বিদেশে সুপরিচত। *

যশোহর জিলাস্থিত নড়াইলের বিখ্যাত জমিদার শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র রায়ের সহিত তাঁহার অন্যতম সরিক শ্রীযুত কালিদাস রায়ের ঘোরতর

* মানদা সুন্দরী বাঙ্গালা ১২৭২ সালে আশ্বিন মাসে, নগেন্দ্রনারায়ণ ১২৭৪ সালে, যতীন্দ্রনারায়ণ ১২৭৫ সালে ৩০শে কার্ত্তিক, জীবেন্দ্রনায়ায়ণ ১২৭০ সালে ভাদ্র মাসে এবং সুরেন্দ্রনারায়ণ ১২৭৯ সালে অগ্রহায়ণ মাসে জন্মগ্রহণ করেন।

বিবাদ ছিল। বিবাদ চলিতেছে এইরূপ অবস্থায় উমেশবাবু দুইটী নাবালক পুত্রসন্তান রাখিয়া পরলোকগমন করেন। অতঃপর তাঁহার সম্পত্তি কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের হাতে যায়; কিন্তু ইহাতেও দুই সরিকের বিবাদ না মিটিয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেই লাগিল। এই সময়ে মাধবনারায়ণের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ও নামডাক হইয়াছিল। কাজেই কালিদাদ বাবু তাঁহার বাটীতে আসিয়া তাঁহার সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। * অপরদিকে কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের ম্যানেজার সাহেবও এই সংবাদ পাইয়া মাধবনারায়ণের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। মাধবনারায়ণ তখন উভয় সঙ্কটে পড়িলেন। সুতরাং তিনি কালিদাস বাবুকে বুঝাইয়া বলিলেন,—"আপনারা দুইপক্ষই আমার আত্মীয়, বিশেষতঃ উমেশবাবুর পুত্রেরা নাবালক; এ অবস্থায় উভয়ের সহিত সদ্ব্যবহার করাই আমার কর্ত্তব্য। অতএব এমন ব্যবস্থা করুন, যাহাতে আপনাদের উভয়পক্ষের সঙ্গেই আমার চিরকাল সৌহার্দ্দ বজায় থাকিতে পারে।" মাধবনারায়ণের মুখে এইরূপ যুক্তিযুক্ত কথা শুনিয়া কালিদাস বাবু, আর কোনও উচ্চবাচ্য করিলেন না, অপর পক্ষীয়েরাও সন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া যাইলেন। কালিদাসবাবু প্রায় একপক্ষ কাল মাধবনারায়ণের আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন এবং তাঁহার দ্বারা স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধি না হইলেও বাটী প্রত্যাবর্ত্তনের সময়ে তিনি তাঁহার আদর-আপ্যায়নের উল্লেখ করিয়া বলিয়া যান,—"আপনি আমার সাহায্য করিলেন না সত্য, কিন্তু আপনার আদর-যত্ন ও সুমধুব বাক্যালাপ এবং বিজ্ঞতার বিষয় আমি জীবনেও ভুলিতে পারিব না।"

---

* ইঁহাকে লোকে ছোট কালীবাবু বলিত। ইঁহাদিগের বরিশাল জেলায়ও সম্পত্তি ছিল। এমন কি, মাধবনারায়ণের সম্পত্তির অধীনও তাঁহাদের কতক সম্পত্তি ছিল। এখনও সেই সম্পত্তি মাধবনারায়ণের পুত্র গিরীন্দ্রনারায়ণ ও সুরেন্দ্রনারায়ণের অধীন আছে।

লখাকাঠীতে সেজরাজা ও ছোটরাজার একটী হাট ছিল। যতদিন রাণী অম্বিকা চৌধুরাণী জীবিতা ছিলেন ততদিন সেজরাজা ও ছোটরাজা পৃথক্ হইলেও এই হাট লইয়া কোনও গণ্ডগোল হয় নাই। রাণী অম্বিকা চৌধুরাণীর মৃত্যুর পর নরনারায়ণের কর্ম্মচারীরা লাখাকাঠীর হাটে গিয়া অত্যাচার আরম্ভ করে। উহারা জোর করিয়া অত্যধিক তোলা তুলিয়া এবং খাজনা আদায় করিয়া দোকানদার ও হাটুয়াগণকে উৎপীড়িত করিত। দোকানদারেরা আসিয়া সেজরাজাকে এই বিষয় জানাইল। সেজরাজা তাঁহার ভ্রাতাকে এই অত্যাচারের কথা বলিলেন; দোকানদারগণও ছোটরাজার নিকটে বিস্তর কান্নাকাটী করিল। কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হইল না। তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া মাধবনারায়ণ লখাকাঠী-নিবাসী তাঁহার প্রজা ও বিশ্বাসভাজন কর্ম্মচারী ভোলানাথ বিশ্বাসের দামোদর তীরে যে জমি ছিল তাহা বন্দোবস্ত করিয়া লইলেন এবং সেইখানে নূতন হাট বসাইলেন। উৎপীড়িত দোকানদারগণ সেজোরাজার এই নূতন হাটে আসিয়া দোকান করিয়া বসিল। তখন ছোটরাজা এই হাটের সন্নিকটে তাঁহার জনৈক প্রজার কিছু জমি ক্রয় করিয়া লইয়া আর একটি হাটের পত্তন করিলেন। এই দুই হাট লইয়া উভয়পক্ষে দাঙ্গা-হাঙ্গামা, মামলা-মকদ্দমা যথেষ্ট হইয়াছিল; জলের মত টাকা খরচ হইয়াছিল; কিন্তু সেজরাজার নূতন হাটের কোনও ক্ষতি হইল না; ছোটরাজার নূতন হাটটীই উঠিয়া গেল।

এই বিবাদ-বিসম্বাদের সময়ে মাধবনারায়ণের বিশ্বাসী কর্ম্মচারী ও প্রজা ভোলানাথ বিশ্বাস প্রাণপণ করিয়া প্রভুর কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিল। এমন কি, সে প্রভুর জন্য কারাগারে যাইতেও সতত প্রস্তুত থাকিত। কর্ম্মচারীর এই প্রভুভক্তি বৃথা যায় নাই। সেজরাজা

প্রজাগণকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। তিনি প্রভুভক্তির পুরস্কার স্বরূপ এই হাটের।৶০ ছয় আনা স্বত্ব তাঁহার কর্ম্মচারী ভোলানাথ বিশ্বাসকে দান করেন; তাহার বংশধরেরা আজিও সেই ছয় আনা স্বত্ব ভোগ করিতেছে। এই হাটের ॥৶০ দশ আনা স্বত্ব তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র গিরিন্দ্রনারায়ণকে দান করেন। এই নূতন হাটের নাম হইল—দামুগঞ্জের হাট। এই হাটে যাতায়াতের জন্য মাধবনারায়ণ ইষ্টদেবতা ঠাকুরদের বাটী হইতে হাট পর্য্যন্ত একটি কাঁচা রাস্তা তৈয়ারী করাইয়া দেন; উহা দৈর্ঘ্যে প্রায় সওয়া ক্রোশ। শ্রীশ্রীবিজয়াদশমীতে মাধবনারায়ণ এই হাটে একটি মেলা বসাইয়াছিলেন। এখনও প্রতি বিজয়াদশমীতে এই মেলা বসিয়া আসিতেছে। ইহার নাম দশহরার মেলা।

নরনারায়ণ দামুগঞ্জের হাট নষ্ট করিবার জন্য আর একবার একটি নূতন হাট বসাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং সেই সম্পর্কে বিস্তর মামলা-মকদ্দমাও হইয়াছিল, কিন্তু তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

দামুগঞ্জের হাটটী বহুদিন পর্য্যন্ত দামোদর ও কালীগঙ্গা নদীদ্বয়ের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত ছিল। সেজরাজার মৃত্যুর পর দামোদর ও কালীগঙ্গা নদীর সঙ্গমস্থল মজিয়া যাওয়ায় দোকানদারগণের নৌকা প্রভৃতি যাতায়াতের অসুবিধা ঘটে ও উহাতে ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষতি হইতে থাকে। সেইজন্য গিরীন্দ্রনারায়ণ ও ভোলানাথ বিশ্বাসের পুত্র ভগবান বিশ্বাসের চেষ্টায় দামুগঞ্জের হাট কালীগঙ্গা নদীর তীরে সরাইয়া আনা হয়। স্থান-পরিবর্ত্তনের সহিত উহার নামেরও পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এখন ঐ হাট হুলার হাট নামে অভিহিত। এই হাটে একটি ষ্টীমার ষ্টেশন আছে; উহার নাম হুলারহাট ষ্টেশন। এই ষ্টেশন হইতে অনেকগুলি ষ্টীমার যাতায়াত করে, অনেকগুলি ষ্টীমার ধরে—যথা বাগেরহাট ষ্টীমার, বানরীপাড়া ষ্টীমার, খুলনা-বরিশাল এক্সপ্রেস ও

মেল ষ্টীমার প্রভৃতি। এই অঞ্চলে নদীর বাঁককে লোকে হুলা বলিয়া থাকে। হাটটী নদীর বাঁকের উপরে অবস্থিত বলিয়া লোকে উহার নাম হুলারহাট দিয়াছে। *

সেজরাজা দিল্লী নিবাসী হোচন্‌খাঁ নামক একজন বিখ্যাত সেতারী ও খেয়াল ধ্রূপদ গায়ককে রাখিলেন। এই সময় ছোটরাজা একটী সখের যাত্রার দল করিলেন এবং দেশস্থ সকলকে সঙ্গীত-বিদ্যায় বিশারদ করিবার চেষ্টা করিলেন। দেশে সঙ্গীতের চর্চ্চা খুব আরম্ভ হইল। ইঁহাদের জ্ঞাতি উপেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী ও বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ চন্দ্রমোহন সাপলাকে রাখিয়া তাহার নিকট হইতে সঙ্গীত শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইঁহাদিগের সমবেত চেষ্টায় দেশের ব্রাহ্মণ কায়স্থ হইতে ধোপা নাপিত পর্য্যন্ত অনেকে, কেহ গানে, কেহ বাজনায় সুপারগ হইয়াছিল। যদিও বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞগণ কেহ কালে, কেহ অকালে কালের করাল-কবলে নিপাতিত হইয়াছিল তথাপি অতীতের স্মৃতি রক্ষার মতন ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, ধোপা, নাপিত ও মুসলমানদিগের মধ্যে এখনও কিছু কিছু পরিমাণে সঙ্গীতের চর্চ্চা দেখা যায়।

মাধবনারায়ণ দেশের উন্নতির জন্য সর্ব্বদা মুক্তহস্ত ছিলেন। তিনি একটী নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন এবং তাহাতে একজন ইংরাজি ভাষার শিক্ষক নিযুক্ত করিলেন। তখন নানাদেশে ইংরেজী শিক্ষা আরম্ভ হইয়াছিল। মাধবনারায়ণ নিয়ম করিলেন যে ভদ্রলোকেরা দিনের

---

* হুলার হাটের দশ আনা সত্ব শ্রীযুত বাবু গিরীন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরীর সত্ব, বাকী বাকী ছয় আনা ভোলানাথ বিশ্বাসের বংশধরগণ ও তদীয় ভ্রাতার বংশধরগণ ভোগ করিতেছে।

বেলায় বিষয়-সম্পত্তি পর্য্যবেক্ষণ ও অন্য সব কার্য্য করিবেন এবং রাত্রিকালে দুই ঘণ্টা করিয়া ইংরেজি শিক্ষা করিবেন। গ্রামস্থ-লোকের স্কুলের প্রতি তাদৃশ সহানুভূতি ছিল না; কাজেই স্কুলটী কিছুদিন চলিবার পর বন্ধ হইয়া গেল।

রায়েরকাঠী তখন বড়ই সুখ ও আরামের স্থান ছিল; খাইবার পরিবার ভাবনা কাহারও ছিল না; এমন রাত্রি ছিল না যে রাত্রিতে বিদেশীয় গায়কগণের গান-বাজনা, বাই, খেমটা, যাত্রা ইত্যাদি কোন না কোনটীর অনুষ্ঠান হইত না। বিদেশীয় আত্মীয়-স্বজনে ও অতিথি-অভ্যাগতে রায়েরকাঠী সর্ব্বদা পরিপূরিত থাকিত। এখন আর সে দিন নাই।

মাধবনারায়ণের দেশস্থ ও দেশের সন্নিকটস্থ গ্রামের লোকেরা তাঁহাকে দেবতাজ্ঞানে ভক্তি-শ্রদ্ধা করিত। কাহারও বৃক্ষে ফল না ধরিলে প্রথম ফলটী মাধবনারায়ণের নামে মানসিক করা হইত; শেষে অফলন্ত বৃক্ষেও ফল দেখা দিত। আম, কাঁঠাল, বেল, পেপে এবং নারিকেল প্রভৃতি মানসিক ফল প্রত্যহ বিস্তর তাঁহার নিকট উপস্থিত হইত; কিন্তু তিনি সে সকলের একটীও ভক্ষণ করিতেন না, সমুদয় ফলই রায়েরকাঠীর অধিষ্ঠাত্রী সিদ্ধেশ্বরী-মাতাকে নিবেদনের জন্য পাঠাইয়া দিতেন। কাহাকেও পাগলা কুকুরে কামড়াইলে মাধবনারায়ণ ইক্ষুগুড়-পড়া দিতেন। তাঁহার এই গুড়-পড়া খাইয়া সহস্র সহস্র কুক্কুর-দষ্ট ব্যক্তি আরোগ্যলাভ করিয়াছে। এই গুড়-পড়া তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনারায়ণ শিখিয়া ছিলেন। তিনি এক্ষণে ঐ গুড়-পড়া দ্বারা বহু কুক্কুর-দষ্ট লোক নিরাময় করিতেছেন। মাধবনারায়ণ প্লীহারোগের এক অব্যর্থ ঔষধ জানিতেন; এক টুকরা শিকড় তামার মাদুলীতে পূরিয়া প্লীহারোগীকে ধারণ করিতে দিতেন;

তাহাতেই প্লীহারোগ দূরীভূত হইত। কত প্লীহারোগী যে এই ঔষধে রোগমুক্ত হইয়াছে তাহার সংখ্যা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মাধবনারায়ণের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এই অব্যর্থ প্লীহারোগের ঔষধ লয়-প্রাপ্ত হইয়াছে।

উদারতায় মাধনারায়ণ সকলের আদর্শস্থানীয় ছিলেন। নিম্নলিখিত ঘটনা হইতেই তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। মহারাণী ভিক্টোরিয়া যখন ভারত-সম্রাজ্ঞী উপাধি ধারণ করেন, সেই সময়ে দিল্লীসহরে যেমন দরবার বসিয়াছিল, বাঙ্গালা দেশের প্রত্যেক জেলাতেও তাহারই আদর্শে একটি করিয়া ছোট রকমের দরবার হইয়াছিল। বরিশাল জেলা-সদরেও এইরূপ একটী দরবার বসিয়াছিল। জেলার জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেট এই দরবারের অনুষ্ঠাতা ছিলেন। দরবারে জেলার জমিদার, তালুকদার, উকীল প্রভৃতি গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। দরবারে পদমর্য্যাদানুযায়ী আসন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেট উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীর অভিমত অনুসারে মাধবনারায়ণের জন্য সর্ব্বপ্রথম স্থান নির্দ্দিষ্ট করেন; কিন্তু মাধবনারায়ণ সভাস্থ সকলকে চন্দ্রদ্বীপাধি-পতির ওয়ারিশকে প্রথম স্থান প্রদান জন্য অনুরোধ করেন এবং সভাস্থ সকলের অভিমত গ্রহণপূর্ব্বক প্রথম আসন চন্দ্রদ্বীপাধিপতির ওয়ারিশকে প্রদান করিয়া নিজে দ্বিতীয় আসনে উপবিষ্ট হ'ন। তাঁহার এই প্রকার মহত্ত্ব ও উদারতা দর্শনে দরবারে সমবেত সকল ব্যক্তিই তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন।

এক সময়ে বরিশাল জেলায় ব্রাহ্মধর্ম্মের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়া-ছিল। ঐ সময় ঐ জেলার লাখুটীয়া গ্রাম নিবাসী প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ জমিদার রাজচন্দ্র রায় মহাশয়ের পুত্র রাখালচন্দ্র রায় ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েন এবং বরিশালের ডাক্তার জগৎচন্দ্র দাস গুপ্ত বিধবা বিবাহ

করেন। * এইরূপে সমস্ত জেলার ভিতরে ব্রাহ্মধর্ম্মের ঢেউ খেলিতে লাগিল। গ্রামে গ্রামে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক দল গঠিত হইল। রায়ের কাঠীতেও এইরূপ একটী দল গঠিত হইয়াছিল। তাহাদের প্রেরণায় বহু ভদ্র বংশীয় হিন্দু ম্লেচ্ছাচার-সম্পন্ন হইয়া উঠিতে লাগিলেন। অনেকেই হিন্দুধর্ম্ম-বিগর্হিত ভোজ্য গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন। কেহ কেহ তাচ্ছিল্য ভরে দেব দেবীকে অগ্রাহ্য করিতে উদ্যত হইলেন। কেহ কেহ দেব দেবীর পূজা পর্য্যন্ত বন্ধ করিলেন। এই বিষম সঙ্কট কালে মাধবনারায়ণ হিন্দুধর্ম্মকে রক্ষা করিতে অগ্রসর হইলেন। তিনি খাঁটী হিন্দু ছিলেন; তাঁহার মাথায় শিখা ছিল। এক একবার সন্ধ্যা করিতে তাঁহার প্রায় ১ ঘণ্টারও অধিক সময় লাগিত। সন্ধ্যা সমাপনান্তে যখন তিনি অপরাধ ভঞ্জনের স্তব পাঠ করিতেন তখন তাঁহার আবৃত্তি ও ঐকান্তিক ভক্তিভাব দেখিলে নিতান্ত মূঢ়ের ও ভক্তির উদ্রেক হইত।

তিনি একটী ধর্ম্ম সভা স্থাপন করিয়া রায়েরকাঠীর হিন্দু সমাজকে উদ্ধার করিলেন। তিনি অর্থ ব্যয় করিয়া পারদর্শী পুরাণ-পাঠক ও কথক আনাইয়া এই সভায় নিয়মিত রূপে পুরাণ-পাঠ ও কথকতা আরম্ভ করাইলেন। কেবল তাহাই নহে, জলাবাড়ী, কেওরা, কীর্ত্তিপাশা প্রভৃতি পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহে কয়েকজন সদ্বক্তা প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা বক্তৃতা দ্বারা হিন্দুধর্ম্মের গূঢ় তত্ত্ব সকল জনসাধারণকে বুঝাইতে লাগিলেন। ফলে যে সকল হিন্দু সন্তান স্বধর্ম্মের প্রতি আস্থাহীন

---

* খ্যাতনামা ৺দুর্গামোহন দাসের বিমাতাকে বিবাহ করেন। সেই জগৎবাবুর ঔরসজাত ও দুর্গামোহন বাবুর বিমাতার গর্ভসম্ভূত পুত্রগণ হইতেছেন মিঃ নলিনীভূষণ দাস গুপ্ত সি-আই-ই, শ্রীযুত বিনয়ভূষণ দাস গুপ্ত এবং ইন্দুভূষণ দাস গুপ্ত।

হইয়া পড়িয়াছিল তাহারা পুনরায় স্বধর্ম্মে আস্থাবান হইতে লাগিলেন। কাহাকে কাহাকেও আবার প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া হিন্দু সমাজে গ্রহণ করাইলেন। এইরূপে তাঁহার ঐকান্তিক আগ্রহ ও যত্নে রায়েরকাঠীতে হিন্দু ধর্ম্মের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রহিল এবং কীর্ত্তিপাশা, জলাবাড়ী প্রভৃতি গ্রামে ব্রাহ্মধর্ম্মের যে ঢেউ উঠিয়াছিল তাহাও থামিয়া গেল।

মাধবনারায়ণের পৈতৃক ঋণের মধ্যে যে গুলির কিস্তিবন্দি হয় নাই সেই গুলির জন্য নালিস হইল। এইরূপ একটী ঋণের পাওনাদার ছিলেন কীর্ত্তিপাশা নিবাসী প্রসন্নকুমার সেন। * সেন মহাশয়ের মৃত্যুর পর তাঁহার পত্নী ষষ্ঠীপ্রিয়া নাবালক পুত্রগণের অবিভাবিকা-স্বরূপ ষ্টেটের কার্য্য পরিচালনা করেন। কর্ম্মচারীদের প্ররোচনায় পড়িয়া তিনি মাধবনারায়ণের নামে পাওনা টাকার জন্য নালিস করেন। কিন্তু এই দুই বংশের মধ্যে চিরদিন যে সম্বন্ধ রহিয়াছে তাহা ভাবিয়া যদি তিনি প্রথমে কর্ম্ম করিতেন তাহা হইলে এই নালিস কখনই হইত না। ষষ্ঠীপ্রিয়া অতিশয় বুদ্ধিমতী ছিলেন; তিনি পরে এই ভ্রম সংশোধন করিলেন।

প্রসন্নকুমারের পূর্ব্ব পুরুষ রামজীবন সেন রাজা রুদ্রনারায়ণের নিকটে কর্ম্ম করিতেন; অতঃপর রাজা রুদ্রনারায়ণের পুত্র রাজা নরোত্তমের সময়ে রামজীবনের পুত্র রত্নেশ্বর পিতৃ-কার্য্যে বহাল থাকেন। রাজা নরোত্তমের পুত্র শত্রুজিতের সময়েও রত্নেশ্বর কিছুকাল কার্য্য করেন। রত্নেশ্বরের পরলোক গমনের পর কৃষ্ণরাম সেন সেই কার্য্যে নিযুক্ত হন। ইনি অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও কর্ম্মপটু ছিলেন বলিয়া নায়েবের

---

* ইনি জাতিতে বৈদ্য ছিলেন। রাজা শত্রুজিৎ ইহাদিগকে মজুমদার উপাধি দেন। তদবধি ইঁহাদের বাটী মজুমদার বাটী নামেই খ্যাত।

পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। রাজা শত্রুজিতের পুত্র রাজা জয়নারায়ণের সময়ে কৃষ্ণরাম সেন লোকাতীত প্রভুভক্তি ও বিশ্বস্ততার পুরস্কার স্বরূপ প্রভূত ভূসম্পত্তি লাভ করেন। এই সময় হইতেই সেন বংশের সৌভাগ্যের সূত্রপাত হয়। রাজা জয়নারায়ণের পুত্র শিবনারায়ণ, কৃষ্ণরামের পুত্র রাজা-রাম সেনকে পিতৃ পদে নিযুক্ত করেন। ইহার পর হইতে সেন বংশীয়দের মধ্যে আর কেহই রায়েরকাঠীতে আসিয়া কার্য্য করেন নাই; কেননা রাজারামের মৃত্যু-সময়ে তাঁহার পুত্র নাবালক ছিলেন এবং সেই সময় তাঁহাদের বিস্তর আয়ও ধন সম্পত্তি হইয়াছিল। কিন্তু প্রসন্নকুমার সেন পর্য্যন্ত পৈতৃক বেতনের টাকা আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করিতেন। এই বেতন যে তাঁহারা অভাবের জন্য গ্রহণ করিতেন তাহা নহে, উহার গ্রহণ তাহারা গৌরবজনক মনে করিতেন এবং তাহাদের দৃঢ় ধারণা ছিল যে, এই বেতনের টাকা তাহাদের "লক্ষ্মী" স্বরূপ অর্থাৎ সেন বংশের সমৃদ্ধি ও শ্রীবৃদ্ধির মূল। প্রসন্নকুমারের স্ত্রী ষষ্ঠীপ্রিয়া মাধবনারায়ণ ও নরনারায়ণ উভয় ভ্রাতার নামেই নালিস করেন। মহেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যুর পর তাঁহার যাবতীয় সম্পত্তি নিলামে উঠে। সেই সময় তাঁহার স্ত্রী অম্বিকা চৌধুরাণী বসতি-বাটী ও কতক সম্পত্তি কর্ম্মচারীদিগের নামে ক্রয় করেন। তৎপরে আরও কিছু সম্পত্তি নিজ নামে ক্রয় করিয়া উহার সহিত সম্মিলিত করিয়া দেন। অতঃপর এই সম্পত্তি মাধবনারায়ণ ও নর-নারায়ণ উভয় ভ্রাতাই সমান ভাবে ভোগদখল করিতে থাকেন। কিন্তু প্রসন্নকুমারের স্ত্রী নালিস করিলে পর নরনারায়ণ আদালতে জবাব দিলেন, "আমি পৈতৃক সম্পত্তি ভোগ করি না।" এই সঙ্গে তিনি প্রমাণাদিও দাখিল করিলেন। উহাতে তিনি অব্যাহতি পাইলেন। মাধবনারায়ণও ইচ্ছা করিলে এইরূপে অব্যাহতি লাভ করিতে

পারিতেন। তাঁহার কর্ম্মচারীরা ও আত্মীয়গণ তাঁহাকে এইরূপে অব্যাহতি পাইবার জন্য উপদেশ প্রদান ও অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু মাধবনারায়ণ সে প্রকৃতির লোকই ছিলেন না। তিনি তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া বলিলেন "বিষয় সম্পত্তি অন্য নামে থাকিলেও যখন পিতার টাকা দ্বারাই এই সকল রক্ষা পাইয়াছে তখন আমি কিছুতেই তাহা অস্বীকার করিতে পারিব না; ইহাতে ভগবানের যাহা ইচ্ছা তাহাই হউক।" মাধবনারায়ণ এই বলিয়া আদালতে জবাব দাখিল করেন যে, "এই নালিস অমূলক। প্রসন্নকুমার আমাদের আপনার লোক। আমার পিতা তমকুস্থকে উষুল না দিয়া বিশ্বাস করিয়া অনেক টাকা দিয়া গিয়াছেন তাহা উষুল না দিয়া এই নালিস রুজু করিয়াছে। বস্তুতঃ উহাদিগের অনেক টাকা পরিশোধ করা হইয়াছিল। এই সময় ১২ বৎসরে তামাদী, এই আইন প্রচলিত হয় এবং উভয় পক্ষে কিছুদিন মোকদ্দমা চলিতে থাকে। অবশেষে দুই পক্ষেরই উকিলগণ একত্র হইয়া মীমাংসার প্রস্তাব করেন। ষষ্ঠীপ্রিয়া সুবিবেচিকা ছিলেন। তিনি সকল দিক বুঝিয়া দেখিয়া মীমাংসায় সম্মত হইলেন এবং মাধব-নারায়ণের রূপ ও গুণের কথা শুনিয়া তাঁহাকে একবার স্বচক্ষে দেখিবার জন্য তিনি অত্যন্ত উৎসুক হইলেন। কিন্তু মাধবনারায়ণ প্রথমতঃ কীর্ত্তিপাশায় যাইতে আপত্তি করিলেন। ষষ্ঠীপ্রিয়া যখন তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য একটী সুবিবেচক কর্ম্মচারী পাঠাইলেন এবং বলিয়া দিলেন যে তাঁহাদের প্রজা ও চিরানুগত কর্ম্মচারীর বাড়ীতে আসিলে সেজ-রাজার সম্মানের কোনই লাঘব হইবে না, বরং উহাদিগকে অনুগৃহিত করা হইবে, তখন বরিশাল জেলার অন্তর্গত কেওড়াগ্রাম নিবাসী বহুদর্শী ও খ্যাতনামা চিকিৎসক মাধবনারায়ণের সভাসদ দুর্গাচরণ সেন কবীন্দ্র মহাশয় ও পিরোজপুর মহকুমার ষষ্ঠীপ্রিয়ার

বিচক্ষণ মোক্তার হরকুমার দাস ও তাঁহার অন্যান্য শুভানুধ্যায়ী সদ্বিবেচক বন্ধুবর্গ কীর্ত্তিপাশায় যাইবার জন্য পরামর্শ দিলেন। মাধবনারায়ণ ষষ্ঠীপ্রিয়ার অনুরোধ রক্ষা করিলেন। মাধবনারায়ণ কীর্ত্তিপাশায় উপস্থিত হইলে ষষ্ঠীপ্রিয়া তাঁহাকে রাজোচিত সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা করেন। তিনি ভোজন আপ্যায়নেরও ক্রটি করেন নাই।

মাধবনারায়ণকে নৌকা হইতে বাটীতে লইয়া যাইবার জন্য তাহার পুত্রগণ নজর দিলেন। নৌকা হইতে বাড়ীতে যাইবার পথের দুই পার্শ্বে কদলী বৃক্ষ রোপিত ও পূর্ণ কুম্ভ সমূহ স্থাপিত হইয়াছিল। তাঁহারা বাদ্য ইত্যাদিরও সবিশেষ আয়োজন করিয়াছিলেন। সংক্ষেপতঃ বলিতে হয় যে মাধবনারায়ণ রাজ-সম্মানে সম্মানিত হইয়া তাহাদের বাড়ীতে উপনীত হইলেন। সেখানেও তাহার পদোচিত সম্বর্দ্ধনা হইয়াছিল। বস্তুতঃ তাঁহার যত্ন-আদর ও সেবা শুশ্রূষার যতদূর সুব্যবস্থা হইতে পারে, তাহা তাঁহারা প্রাণপণ শক্তিতে করিয়াছিলেন। ষষ্ঠীপ্রিয়া যেরূপ কার্য্য-দক্ষা ও বুদ্ধিমতী ছিলেন সেইরূপ গুণবতীও ছিলেন। তিনি মানীর আদর করিতে জানিতেন। তাঁহার নম্র ও শিষ্টাচার-পূর্ণ মধুর ব্যবহারের প্রসংশা তাঁহার শত্রুগণও পর্য্যন্ত করিতেন। মাধবনারায়ণ বাটীতে পদার্পণ করিলে তিনি তাঁহাকে নিজ দেওয়ান ও প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীদিগের দ্বারা নজর দেওয়াইলেন এবং পরিশেষে বিনয়ের সহিত 'সেজ রাজাকে নিবেদন করাইলেন "আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ রাজার পূর্ব্বপুরুষগণের অন্নে প্রতিপালিত; রাজাদের নিকটে কার্য্য করিয়াই আমাদের অবস্থা উন্নত হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় রাজবংশধরেরা আমাদের ব্যবহারে ক্ষুন্ন বা অসন্তুষ্ট হইলে আমাদের মঙ্গল হইবে না। আমাদের পাওনা টাকা ছাড়িয়া দিলেও আমরা আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার জন্য তাঁহাদের নিকটে যে

অচ্ছেদ্য ঋণ জালে আবদ্ধ তাহার কণমাত্রও পরিশোধ হইবে না, সে কৃতজ্ঞতার ঋণ অপরিশোধনীয়। বিশেষতঃ আমার শ্বশুর রাজার পিতাঠাকুর মহাশয়ের নিকট হইতে সুদ বাবদ অনেক টাকা পাইয়াছেন, কাজেই এখন রাজা সন্তুষ্ট চিত্তে যাহা দিতে স্বীকৃত হইবেন আমি নাবালকের ষ্টেটের অছি স্বরূপ তাহাতেই সম্মত হইব। তিনি যদি খতের আসল ১৫০০৲ টাকা দেন তবে আমি বাকি টাকার দাবী ত্যাগ করিতে স্বীকৃত আছি। ইহাতে যদি তিনি অসন্তুষ্ট হন তাহা হইলে এই টাকা আমি নিজ হইতে ষ্টেটে জমা দিব, রাজার নিকট হইতে এক পয়সাও লইব না এবং সমস্ত দাবী ছাড়িয়া দিব।"

মাধবনারায়ণ দেখিলেন যে টাকার নালিশ হইয়াছে তাহা সমস্ত ডিক্রী হইলে তাহাকে ভয়ানক বিপদে পড়িতে হইবে। তিনি ষষ্ঠী-প্রিয়ার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং ১৫০০৲ টাকা দিতে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু তখন তাঁহার তহবিলে টাকা ছিল না বলিয়া এই টাকার জন্য একখানি রেজেষ্ট্রীকৃত তমস্থক লিখিয়া দিবার প্রস্তাব করিলেন। ষষ্ঠীপ্রিয়া ইহাতে সম্মত হইলেন। অতঃপর মাধবনারায়ণ রায়েরকাঠীতে প্রত্যাগমন করিলেন। প্রতিশ্রুতিমত যথাসময়ে উক্ত তমস্থক রেজিষ্ট্রী করিয়া পাঠাইয়া দিলেন। এই তমস্থক পাইয়া ষষ্ঠীপ্রিয়া মামলা উঠাইয়া আনিলেন। মাধবনারায়ণ এই তমস্থকের টাকা শীঘ্রই পরিশোধ করিলেন।

প্রকৃতপক্ষে ষষ্ঠীপ্রিয়া মাধবনারায়ণকে সুদবাবদ অনেক টাকা ছাড়িয়া দিলেন। মাধবনারায়ণ ষষ্ঠীপ্রিয়ার এইরূপ ভদ্র ব্যবহারে মুগ্ধ হইলেন এবং আজীবন তাঁহার প্রশংসা করিতেন। কীর্ত্তিপাশার সেনবংশ অতি ধার্ম্মিক ও সত্যবাদী। ইহারা ভদ্র ও নম্র ব্যবহারে বরিশাল জেলায় সুবিখ্যাত। ইহাদের ভূসম্পত্তিও যথেষ্ট। মাধবনারায়ণ কীর্ত্তিপাশায়

উপস্থিত হইলে ষষ্ঠীপ্রিয়া দেবীর ছয় আনীর অংশীদার শশিভূষণ সেনের মাতাও তাঁহাকে পরম সমাদরের সহিত অভ্যর্থিত করিয়াছিলেন। কেবল তাহাই নহে, তিনি নিজ পোষ্যপুত্র শশিকুমার সেনকে দিয়া নজর দেওয়াইয়া ছিলেন এবং নিমন্ত্রণ করিয়া নানাবিধ উপাদেয় ভোজে পরিতৃপ্ত করাইয়া ছিলেন।

ক্রমে মাধনারায়ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র ও কন্যার বিবাহ দিবার সময় উপস্থিত হইল। খুলনা জেলার অন্তর্গত বনগ্রাম-নিবাসী সহজ মুখ্য কুলীন শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন মিত্র মহাশয়ের সর্ব্ব-সুলক্ষণা কন্যা শ্রীমতী চন্দ্রমোহিনীর সহিত জ্যেষ্ঠপুত্র গিরীন্দ্রনারায়ণের বিবাহ দিলেন। যশোহর জেলার অন্তর্গত ইতনা গ্রাম নিবাসী সহজ মুখ্য কুলীন মহেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র শ্রীমান প্রকাশচন্দ্র ঘোষের সহিত কন্যা শ্রীমতী মানদাসুন্দরীর শুভ পরিণয়কার্য্য সম্পন্ন করেন। এই উপলক্ষে তিনি দেশস্থ ও সমাজস্থ লোকদিগকে ভূরি ভোজনে আপ্যায়িত করেন। কন্যা জামতাকে বংশের চির-প্রথা অনুযায়ী বরাভরণ, বরশয্যা, অলঙ্কার এবং নিজ তালুক জোলাগাতী হইতে কতেক ভূসম্পত্তি দান করেন। এই সম্পত্তি অদ্যাপি তাহার কন্যা ও দৌহিত্রেরা ভোগ করিতেছেন। এই বংশে * স্বপর্য্যায়-বিবাহ সম্পন্ন হইত। মাধবনারায়ণের পুত্র ও কন্যা ২৭শের পর্য্যায় ছিলেন। কাজেই তাঁহার পুত্রবধূ ও জামাতা এই পর্য্যায় হইয়াছিলেন। এইরূপ পর্য্যায় মিল করিয়া বিবাহ দক্ষিণ-রাঢ়ীয় মৌলিক সমাজে খুবই কমই দৃষ্ট হয়। এখন কেহ কেহ এই নিয়ম মানিয়া চলেন না। দুঃখের বিষয় এই যে মাধবনারায়ণ এই বিবাহে উপস্থিত থাকিয়া বিবাহকার্য্য সম্পন্ন করাইতে পারেন নাই।

---

* প্রথম পুরুষ হইতে যত পুরুষ হয় তাহাই বংশের পর্য্যায়।

তাঁহাকে তখন কয়েকটী গুরুতর মামলার জন্য বরিশাল সহরে যাইতে হইয়াছিল। তাঁহার বুদ্ধিমতী সহধর্ম্মিণী ও প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীরা ১৭৯৮ শকাব্দে বাঙ্গলা ১২৮৩ সালে এই বিবাহ কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন।

মাধবনারায়ণের ভ্রাতা নরনায়ণ নিজগ্রামে শিক্ষার প্রচলন মানসে ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে (বাঙ্গালা ১২৬৬ সালে) "মডেল স্কুল" নাম দিয়া একটী স্কুল প্রতিষ্ঠিত করেন। এই স্কুলটী ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে (বাঙ্গালা ১২৬৮ সালে) মধ্যইংরেজীস্কুলে পরিণত হয়। তখনকার দিনে সমগ্র বরিশাল জেলায় দুই তিনটীর অধিক মধ্যইংরেজীস্কুল ছিল কিনা সন্দেহ। স্কুলটীতে বাঙ্গালা শিক্ষার জন্য দুইজন এবং ইংরেজী শিক্ষা দিবার জন্য ৩ জন শিক্ষক নিযুক্ত করা হইয়াছিল। এই স্কুলে গবর্ণমেণ্ট সাহয্য প্রদান করিতেন। তাহাতেও ছাত্রদের বেতনে স্কুলের ব্যয় সঙ্কুলন হইত না; সেইজন্য বক্রী টাকা যাহা লাগিত তাহা নরনারায়ণ যোগাইতেন। তিনি অনেকদিন পর্য্যন্ত এই খরচা চালাইয়া ছিলেন। ক্রমে গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত সাহায্যের টাকার পরিমাণ ৪০৲ টাকা পর্য্যন্ত হইল। কিন্তু নরনারায়ণের আর্থিক অবস্থা ক্রমশঃ মন্দ হইতে মন্দতর হইতে লাগিল। এই সময়ে তাঁহার অন্য সরিক চন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী মহাশয় অপর একটী স্কুল স্থাপন করিলেন, কিন্তু তাহাও স্থায়ী হইল না। এদিকে প্রতি-যোগিতার ফলে কয়েক বৎসর পরে অর্থাভাবে নরনারায়ণকে নিজ স্কুলটী বন্ধ করিতে হইল।

এই সময়ে চন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী মহাশয় * জীবিত ছিলেন না। তাঁহার পত্নীদ্বয় শ্রীযুক্তা মনোমোহিনী চৌধুরাণী ও শ্রীযুক্তা বসন্তকুমারী

* তাঁহার পুত্র খ্যাতনামা রায় সত্যেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী বাহাদুর বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য এবং উকীল।

চৌধুরাণী নাবালক পুত্রদ্বয়ের ষ্টেটের একজিউট্রীক্স কার্য্য চালাইতেন। শ্রীযুক্তা বসন্তকুমারী চৌধুরাণী যেরূপ বুদ্ধিমতী সেইরূপ পরোপকার-পরায়ণা ছিলেন। তিনি, শ্রীযুক্ত অদ্বৈতনারায়ণ রায় চৌধুরী এবং শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার মিত্র একত্র হইয়া মাধবনারায়ণকে অনুরোধ করিলেন,—"আপনি স্কুলটী পুনরায় স্থাপন করুন।" ইহাতে মাধবনারায়ণ বলিলেন,—"আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা এই স্কুলটীর জন্য বিস্তর টাকা খরচ করিয়াছে; সে যদি সন্তুষ্টচিত্তে আমাকে এই কার্য্যের ভার লইতে বলে তবেই আমি তাহা লইতে পারি।" নরনারায়ণ সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহাকে স্কুল পুনঃ স্থাপনের জন্য অনুরোধ করিলেন। তখন মাধবনারায়ণের সবিশেষ চেষ্টায় স্কুলটী পুনঃ স্থাপিত হইল। মাধবনারণ স্বয়ং স্কুলটীর সেক্রেটারী হইলেন; শ্রীযুত অদ্বৈতনারায়ণ রায় চৌধুরী সহকারী সেক্রেটারী এবং শ্রীযুক্তা বসন্তকুমারী চৌধুরাণী, শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার মিত্র ও শ্রীযুক্ত সথানাথ মিত্র প্রভৃতি স্কুল-পরিচালন-কমিটীর মেম্বার হইলেন। ইংরাজী ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে (বাঙ্গালা ১২৮৫ সালে) স্কুলটী পুনঃ স্থাপিত হয়। এই সময়ে মেম্বারগণের প্রদত্ত চাঁদা ও ছাত্রদিগের প্রদত্ত সামান্য বেতনের টাকায় স্কুলের খরচ পোষাইত না; কাজেই স্কুল পরিচালনার জন্য যখন যে টাকার দরকার হইত মাধবনারায়ণ স্বয়ং তাহা দিতেন। এইরূপে কিছুকাল স্কুল চলিলে পর ২১৲ টাকা সরকারী সাহায্য মঞ্জুর হয়; পরে সাহায্যের পরিমাণ ২৪৲ টাকায় উঠে। প্রথম অবস্থায় স্কুলে দুইজন বাঙ্গালা ও দুইজন ইংরেজী শিক্ষক ছিলেন। বিক্রমপুরের অন্তর্গত সুবর্ণগ্রাম-নিবাসী (সোণার গাঁ) নিবাসী কালীকিশোর দে মহাশয় হেড পণ্ডিত এবং ফরিদপুর জেলার কুলপদ্দি গ্রাম-নিবাসী কৈলাসচন্দ্র বসু মহাশয় হেড মাষ্টার ছিলেন।* ক্রমে ক্রমে

* ইনি পরে মাদারীপুরেরর অন্যতম প্রসিদ্ধ উকীল হইয়াছিলেন।

স্কুলটী উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে লাগিল; স্কুলের ছাত্রসংখ্যাও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; বহু ছাত্রও এই স্কুল হইতে ছাত্রবৃত্তি ও মাইনর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে লাগিল। * স্কুলটী ভালরূপে চলিতেছে দেখিয়া মাধবনারায়ণ অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। রাজবংশীয় খ্যাতনামা রায় সত্যেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী বাহাদুর এই স্কুল হইতে মাইনর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রথম বৃত্তিলাভ করেন।

বিদেশে ছেলে রাখিয়া শিক্ষা দিতে হইলে অনেক টাকা খরচ পড়ে এবং তথায় অভিভাবকহীন হইয়া ছেলেরাও উচ্ছৃঙ্খল হইতে পারে এই মনে করিয়া অভিভাবকগণ মাধবনারায়ণকে অনুরোধ করিলেন,—"আপনি স্কুলটীকে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে পরিণত করুন।" এদিকে শ্রীযুক্ত অদ্বৈতনারায়ণ রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার মিত্র ও শ্রীযুক্তা বসন্তকুমারী চৌধুরাণী অগ্রণী হইয়া স্কুলটী যাহাতে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে পরিণত হয় সেই বিষয়ে মাধবনারায়ণকে বিশেষ করিয়া ধরিয়া বসিলেন ও তাঁহাকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। শ্রীযুক্ত অদ্বৈত নারায়ণ রায় চৌধুরী মহাশয় তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি ও বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি মাধবনারায়ণকে বিশেষ ভক্তি-শ্রদ্ধা করিতেন, মাধবনারায়ণও তাঁহাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। এই সদ্ভাব মাধবনারায়ণের জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্তও ছিল। তিনি মাধবনারায়ণের বংশধরগণকেও স্নেহের চক্ষে দেখিতেন এবং তাঁহাদের উপকার করিতে তিনি কদাপি পরাঙ্মুখ হইতেন না। মাধবনারায়ণ ইঁহাদিগকে এই কার্য্যে অগ্রণী দেখিয়া ১৮৮২

---

* সিটি কলেজের সংস্কৃত ও বঙ্গভাষার প্রধান অধ্যাপক পণ্ডিত উপেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী বিদ্যাভূষণও এই স্কুলের ছাত্র। এই স্কুল হইতে অনেক ছাত্র পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া কেহবা হাইকোর্টের উকিল কেহবা ডাক্তার হইয়াছেন।

খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে (বাঙ্গালা ১২৮৯ সালে) মধ্য ইংরেজী স্কুলটীকে উচ্চ ইংরেজী স্কুলে পরিণত করিলেন। বাসণ্ডাগ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত রসিক চন্দ্র দাস হেড মাষ্টার নিযুক্ত হইলেন। মাধবনারায়ণের সভাপণ্ডিত প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণিক বিশ্বেশ্বর তর্ক পঞ্চানন মহাশয়কে হেডপণ্ডিত-পদে নিযুক্ত করা হইল। স্কুলে তখন ইংরেজী শিক্ষক ছিলেন মোট ৪ জন এবং সংস্কৃত ও বাঙ্গলা শিক্ষক ছিলেন তুইজন।

সুপ্রসিদ্ধ শশিশেখর দত্ত মহাশয় এই সময়ে পিরোজপুরের সব-ডিবিসন্যাল অফিসার অর্থাৎ মহকুমা-হাকিম ছিলেন। তিনিও ঠিক এই সময়েই পিরোজপুরের মাইনর স্কুলটীকে এণ্ট্রান্স স্কুলে পরিণত করেন। যাহাতে রায়েরকাঠীর এণ্ট্রান্স স্কুলটী না থাকে সেই জন্য শশীবাবু প্রাণপণ চেষ্টা আরম্ভ করিলেন; কারণ, এই স্কুলটী বন্ধ না হইলে পিরোজপুরের স্কুলটীর উন্নতি হইতে পারে না। তুইটী স্কুলেই ঘোরতর প্রতিযোগিতা চলিতে লাগিল।

শশীবাবু মাধবনারায়ণকে জব্দ করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার প্রস্তুত রাস্তাটী মেরামত করিয়া দিবার জন্য ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড হইতে এই মর্ম্মে নোটীশ দেওয়াইলেন যে, হয় রাস্তাটি ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের হাতে দেওয়া হউক, নতুবা মেরামত করা হউক। ভ্রাতার সহিত পৃথক্ হইবার পরেও মাধবনারায়ণ একবার দক্ষিণ দিকের রাস্তাটী মেরামত করিয়াছিলেন। পুনরায় রাস্তাটী খারাপ হইয়াছিল। এখন মজুরী ও মাল মসলার অত্যধিক মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় মাধবনারায়ণ রাস্তাটী আর মেরামত করিতে পারিলেন না। তিনি বাধ্য হইয়া রাজবাটীর সম্মুখস্থ রাস্তাটুকু বাদ রাখিয়া বাকী সমস্ত রাস্তা ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ডের হস্তে অর্পণ করিলেন। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড রাজবাটীর সম্মুখস্থিত রাস্তাটুকু বাদ রাখিয়া হরসুন্দরী-পুষ্করিণীর পূর্ব্বদিক্ হইতে নূতন রাস্তা করিয়া পুরাতন রাস্তার সহিত

সংযুক্ত করিয়া দিলেন এবং সমুদায় রাস্তাটি মেরামত করাইলেন। রাজবাটীর সম্মুখস্থিত যে রাস্তাটুকু ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডকে দেওয়া হয় নাই, তাহা রায় সত্যেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী বাহাদুর ও নগেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরীর চেষ্টায় মিউনিসিপ্যালিটী ও সেটেলমেণ্ট কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক "মাধবনারায়ণ রোড" নামে অভিহিত হইয়াছে।

শশীবাবু চেষ্টা করিয়া পিরোজপুরের স্কুলটীর জন্য সরকারী সাহায্য পাইলেন; কিন্তু বিস্তর চেষ্টা করিয়াও রায়েরকাঠীর স্কুলটীতে সরকারী সাহায্য মিলিল না। পুনঃ পুনঃ ইনস্পেক্টর ও ডিরেক্টরের নিকটে দরখাস্ত পাঠাইয়াও কোনও ফল হইল না। এমন কি মাইনর স্কুলে যে সাহায্য ছিল ইনস্পেক্টর ও ডিরেক্টরের সুবিবেচনার ফলে তাহা পর্য্যন্তও মিলিল না। তখন গ্রাম্য লোকদিগের উৎসাহ হ্রাস পাইল; সকলেরই মন ভাঙ্গিয়া গেল। যাঁহাদের শিক্ষা দিবার উৎসাহ ও ইচ্ছা ছিল তাঁহারা এই স্কুলে সাহায্য নাই দেখিয়া ছেলেদের প্রাইভেট স্কুলে পড়াইতে অনিচ্ছুক হইলেন। ছাত্রদিগের মধ্যে শিক্ষার জন্য কতক বরিশালে, * কতক পিরোজপুরে ও কতক কলিকাতায় প্রেরিত হইল। একেই স্কুলে ছাত্র-বেতন অত্যল্প ছিল; তাহার উপর এইরূপে ছাত্র-সংখ্যাও হ্রাস পাইল। সুতরাং স্কুলের আয় অত্যন্ত কমিয়া গেল। মেম্বারগণ মধ্যেও অনেকে চাঁদা দেওয়া বন্ধ করিলেন। ইহার পরেও তিন বৎসর মাধবনারায়ণ স্বয়ং স্কুলটীর খরচা চালাইয়া উহাকে বজায় রাখিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু যখন তিনি দেখিলেন যে, এই স্কুলের দ্বারা গ্রামের লোকদিগের কোনও উপকার হইতেছে না, বরং বৃথা অর্থব্যয়

* তখন বরিশাল জেলায় জেলাস্কুল ব্যতীত আর এণ্ট্রান্স স্কুল ছিল না এবং প্রাইভেট স্কুলকে লোকে স্কুলই মনে করিত না।

হইতেছে, তখন তিনি উপায়ান্তর না দেখিয়া স্কুলটীকে আবার মাইনর স্কুলে পরিণত করেন।

নড়াইল-নিবাসী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ ঘোষ নামক এণ্ট্রেন্স স্কুলের জনৈক শিক্ষককে স্কুলের হেড মাষ্টার এবং অশ্বিনীকুমার সরকার মহাশয়কে হেড পণ্ডিত নিযুক্ত করেন। অনেক চেষ্টার পর স্কুলে ১৮৲ টাকা সরকারী সাহায্য বরাদ্দ হয়। এই স্কুলটীকে মাধবনারায়ণ তাঁহার জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত প্রাণপণে রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার পত্নী শ্রীযুক্তা জগৎমোহিনীও তিন বৎসর স্কুলটীকে রক্ষা করেন। এই সময়ে পূর্ণমাত্রায় গৃহবিবাদ আরম্ভ হইল। সরিক জ্ঞাতিদিগের মধ্যে কেহ কেহ হিংসা-প্রণোদিত হইয়া স্কুলটীর পর্য্যন্ত অনিষ্ট সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রীযুক্তা জগৎমোহিনী চৌধুরাণী তখন একে দেবতুল্য স্বামী-বিয়োগে কাতরা, তদুপরি গৃহ-বিবাদ ও জ্ঞাতি-বিরোধে সর্ব্বদাই উত্ত্যক্ত ও অতিষ্ঠ ; কাজেই তিনি অনন্যোপায় হইয়া অবশেষে স্কুলের তদানীন্তন হেড মাষ্টার শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর রক্ষিত মহাশয়ের পরামর্শে এবং জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী ও জামাতা পিরোজপুরের উকীল শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সম্মতিক্রমে স্কুলের সেক্রেটারী পদ ত্যাগ করেন এবং ঐ পদ তাঁহার দেবর নরনারায়ণকে প্রদান করেন। কিন্তু তাঁহারও আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল না থাকায় তিনিও বেশীদিন স্কুলের খরচ জোগাইতে সমর্থ হইলেন না ও সেক্রেটারী-পদ ত্যাগ করিলেন। পরে দুর্গানারায়ণ রায় চৌধুরী * স্কুলের সেক্রেটারী হ'ন ; সম্প্রতি তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত সারদারঞ্জন রায় চৌধুরী স্কুলের সেক্রেটারী-পদে নিযুক্ত আছেন।

* শ্রীদুর্গানারায়ণ রায় চৌধুরী মহাশয় অতি নিরীহ ও সাধু প্রকৃতির লোক ছিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

সন ১২৯১ সালের পৌষ মাসে জুবার্ট সাহেবের তত্বাবধানে কলিকাতায় একটী একজিবিশন বা প্রদর্শনী হয়। মাধবনারায়ণ একজিবিশন দেখিবার জন্য তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ও মধ্যম পুত্রকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় গমন করেন। সে সময় কলিকাতায় যাইবার জন্য রেল-ষ্টীমারের সুবিধা ছিল না। কাজেই তাঁহাকে নৌকাযোগেই কলিকাতায় যাইতে হইয়াছিল। সঙ্গে পুত্রদ্বয় ব্যতীত কর্ম্মচারী, ভৃত্যাদি বহুলোক ছিল। তাঁহার কলিকাতায় যাইবার কয়েক মাস পরে কলিকাতা হইতে খুলনা পর্য্যন্ত রেল লাইন এবং খুলনা হইতে পিরোজপুর ও বরিশাল পর্য্যন্ত ষ্টীমার লাইন খোলা হয়। ফ্লোটীলা কোম্পানী প্রথমে ষ্টীমার চালাইতে আরম্ভ করেন। রায়ের কাটীতে ফিরিবার সময়ে মাধবনারায়ণ কলিকাতা হইতে খুলনা পর্য্যন্ত রেলেই ফিরিয়াছিলেন। মাধবনারায়ণ যখন কলিকাতায় গমন করেন তখন তাঁহার ভ্রাতা নরনারায়ণও পৃথক্ বজরায় কলিকাতায় যাত্রা করেন। কলিকাতায় পৌঁছিবার কিছু দিন পরে তাঁহার শ্বশুর মধুসূদন ঘোষ মহাশয়ের পরলোকপ্রাপ্তি হয়। মাধবনারায়ণ ও নরনারায়ণ দুই ভাই সেই সময় উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার সৎকারকার্য্য সম্পন্ন করেন। এই কার্য্যে চেৎলার বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি যোগদান করিয়াছিলেন। কলিকাতায় অবস্থান করিবার সময় মাধবনারায়ণ ঠনঠনিয়ার খ্যাতনামা রায় গিরীশচন্দ্র দাস বাহাদুরের বাটীতে বিবাহ উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হন। ইঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হেরম্বচন্দ্র দাস

মহাশয় মাধবনারায়ণের ভায়রাভাই ছিলেন। * যথা-সময় তিনি বিবাহ-সভায় উপস্থিত হ'ন। ময়ূরভঞ্জের মহারাজ এবং কলিকাতার বহু গণ্যমান্য লোক এই সভায় সমবেত হইয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই মাধবনারায়ণের সহিত আলাপ-পরিচয় করিয়া তাঁহার বিজ্ঞতা দর্শনে প্রীত হইলেন। দীনবন্ধু ঘটক এবং ঈশানচন্দ্র ঘটকও এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। মালা-চন্দন দিবার কথা উঠিলে তাঁহারা প্রস্তাব করিলেন যে মাধবনারায়ণকেই মালা-চন্দন দেওয়া হউক, কারণ তিনি গোষ্ঠীপতি মৌলিক এবং সর্ব্বগুণালঙ্কৃত, বিশেষতঃ তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ বহু ব্রাহ্মণ ও কুলীনের প্রতিপালক ; সুতরাং তিনি এখানে উপস্থিত থাকিতে অন্য কোনও মৌলিক মালা-চন্দন পাইতে পারেন না। অতঃপর সর্ব্বসম্মতিক্রমে মাধবনারায়ণকেই মাল্য চন্দনে ভূষিত করা হয়। †

এই ঘটনার কয়েক দিন পরে শোভাবাজারের শ্রীযুক্ত কালিদাস মল্লিক মহাশয় কালীঘাটে মাধবনারায়ণের বাসায় উপস্থিত হ'ন এবং তাঁহাকে ও তদীয় পুত্রগণকে নিমন্ত্রণ করেন। কালীবাবু এই সময়ে তাঁহার শ্বশুর স্বর্গীয় প্রসন্নকুমার দেব রায় বাহাদুরের বাটীতে বাস করিতেন, কেননা তিনি শ্বশুরের মৃত্যুর পর নাবালক শ্যালকদের অভি-ভাবক স্বরূপ তাহাদের বিষয়-সম্পত্তি তত্ত্বাবধান করিতেন। মাধব-

---

* রায় গিরিশচন্দ্র দাস বাহাদুর গভর্ণমেণ্টের তোষাখানার দেওয়ান ছিলেন। ঠনঠনিয়ায় যে হেরম্বদাসের লেন আছে তাহা গিরিশবাবুর অগ্রজ হেরম্ববাবুর নামেই হইয়াছে। ইঁহারা ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন এবং কলিকাতাস্থ দক্ষিণ রাঢ়ীয় সমাজে বিশেষ সুপরিচিত।

† এই মাল্যচন্দন কায়স্থ মৌলিকদিগের বড়ই সম্মানের বস্তু।

নারায়ণ তদীয় মধ্যমপুত্র নগেন্দ্রনারায়ণকে সঙ্গে লইয়া নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবার জন্য স্বর্গীয় প্রসন্নকুমার দেব রায় বাহাদুরের বাটীতে উপস্থিত উপস্থিত হ'ন। জ্যেষ্ঠপুত্র গিরীন্দ্রনারায়ণ অসুস্থ ছিলেন বলিয়া নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারেন নাই। ভোজনান্তে মাধবনারায়ণ কালীবাবুকে বলিলেন,—"রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের মধ্যমপুত্র রাজা রাজেন্দ্র-নারায়ণ দেব বাহাদুর ও ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের সহিত আমার বিশেষ সৌহার্দ্দ আছে। রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের বাটীতেই তাঁহাদের উভয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইবে ; অতএব চলুন তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসি।" তখন কালীবাবু মাধবনারায়ণ ও তাঁহার মধ্যম পুত্রকে লইয়া গিয়া রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণের সহিত সাক্ষাৎ করাইলেন। এই সময়ে রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণের দৃষ্টিশক্তি লোপ পাইয়াছিল। তিনি কালীবাবুর নিকটে মাধবনারায়ণ ও তাঁহার পুত্রের আগমনের কথা শুনিয়া পরম আনন্দিত হইলেন এবং মাধবনারায়ণকে বিশেষরূপে অভ্যর্থনা করিয়া নিজ গদীর উপর এবং তদীয় পুত্র নগেন্দ্রনারায়ণকে গদীর উপর নিজ ক্রোড়ে উপবেশন করিতে বলিলেন। কিন্তু মাধব-নারায়ণ অত্যন্ত বিনয়ী ছিলেন ; তিনি বলিলেন,—"আপনি আমার বয়োজ্যেষ্ঠ, আমি কখনই আপনার সহিত একাসনে বসিতে পারি না।" রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ কিছুতেই তাঁহার কথা শুনিলেন না, বরং বলি-লেন,—"আপনি জ্যেষ্ঠানুক্রমে ভূঁঞিয়া কিঙ্করের বংশধর এবং আমাদের চেয়ে অনেক প্রাচীন জমিদার, আপনি এই গদীতে আমার নিকটে বসিলে কোন দোষই হইতে পারে না।" উপায়ান্তর না দেখিয়া তখন মাধব-নারায়ণ গদীর এক পার্শ্বে উপবেশন করিলেন, কিন্তু তাঁহার পুত্র নগেন্দ্র-নারায়ণ কিছুতেই ক্রোড়ে উপবেশন করিলেন না, তিনি তাঁহার নিকটে গদীর নিম্নে ফরাসের উপর বসিয়া রহিলেন। দুইজনে বহুক্ষণ ধরিয়া

আলাপ চলিল। অতঃপর ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইল। ঈশ্বরচন্দ্র মাধবনারায়ণের বাল্যবন্ধু এবং দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ সমাজে সবিশেষ সম্মানার্হ ও মুখ্য কুলীন ছিলেন। তিনি পার্শীতে ও ইংরাজিতে বিশেষ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন। বিদায় গ্রহণের সময়ে রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ দেব বাহাদুর মাধবনারায়ণকে বলিলেন,—"আমি এখন বৃদ্ধ হইয়াছি, দৃষ্টিশক্তিও লোপ পাইয়াছে, আপনার বাটীতে যাইয়া দেখা করিবার সাধ্য আমার নাই, অতএব আপনি যতদিন কলিকাতায় আছেন আমার সহিত মধ্যে মধ্যে অনুগ্রহ করিয়া সাক্ষাৎ করিলে কৃতার্থ হইব।"

এই সময়ে মাধবনারায়ণ ভূকৈলাসের রাজা সত্যবাদী ঘোষাল মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনি মাধবনারায়ণের গুণের বড়ই পক্ষপাতী ছিলেন এবং তাঁহার বড়ই প্রশংসা করিতেন।

মাধবনারায়ণের শ্বশুর পাণিহাটী নিবাসী খ্যাতনামা শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয় তখন কলিকাতায় নন্দরাম সেনের গলিতে বাস করিতে-ছিলেন। জামাতা কলিকাতায় আগমন করিয়াছেন শুনিয়া তিনি তাঁহাকে নিজবাটীতে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যাইলেন। তিনি বহুদিন পরে জামাতাকে দেখিতে পাইয়া পরম আনন্দিত হইলেন এবং মধ্যে মধ্যে তাঁহার সহিত দেখা করিতে বলিলেন। শ্বশুরের কথানুযায়ী মাধবনারায়ণ মধ্যে মধ্যে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। এই সময়ে মাধবনারায়ণের মধ্যমপুত্র নগেন্দ্রনারায়ণের সহিত মজিলপুর-নিবাসী বিখ্যাত জমীদার হেমচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের বন্ধুত্ব হয়। হেমবাবু ইংরেজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষায় সবিশেষ পারদর্শী, সুগায়ক ও সর্ব্বগুণে অলঙ্কৃত ছিলেন। তিনি নিঃসন্তান ছিলন। নগেন্দ্রবাবুর সহিত বন্ধুত্ব হইয়া ছিল বলিয়া হেমবাবু

মাধবনারায়ণকে পিতার ন্যায় ভক্তি করিতেন এবং সময়ে সময়ে মামলা মোকদ্দমা-সংক্রান্ত পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। হেমবাবু যতদিন কালীঘাটে ছিলেন, প্রায়ই মাধবনারায়ণ ও নগেন্দ্রনারায়ণকে নিমন্ত্রণ করিয়া নানাবিধ উপাদেয় সামগ্রী ভোজন করাইতেন। মাধবনারায়ণের নিকট তিনি ধর্ম্মোপদেশও গ্রহণ করিতেন। মাধবনারায়ণের বাসা-বাটীর সংলগ্ন অন্য একটী মহলে তিনি বাস করিতেন। উভয় বাটীতে প্রবেশ করিবার একটাই সিঁড়ি ছিল। কালীঘাটের নির্ম্মল হালদার মহাশয় এই বাটীর মালিক ছিলেন। এই বাটী দুইখানিঅদ্যাপি কালীঘাটের রাস্তার উপর বর্ত্তমান আছে।

একজিবিশন শেষ হইলে মাধবনারায়ণ কলিকাতা-স্থিত আত্মীয় ও বন্ধুবর্গের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া রায়েরকাঠীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

সেজ রাজা ও তদীয় ভ্রাতা ছোট রাজা বৈষয়িক কার্য্য উপলক্ষে একবার জলাবাড়ী গিয়াছিলেন, তখন শ্রীযুক্ত কালিনাথ বিশ্বাস জীবিত ছিলেন না। তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ বিশ্বাস এবং তাহার ভ্রাতাগণ জীবিত ছিলেন; কিন্তু তাঁহাদের ষ্টেটের কর্ত্তা তখন বৈকুণ্ঠ বাবুই ছিলেন। বৈকুণ্ঠ বাবু সেজরাজা ও ছোটরাজার আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ভ্রাতৃগণ সহ তাঁহাদের খালঘাট পর্য্যন্ত আসিয়া সেজরাজা ও ছোটরাজাকে নজর প্রদান করতঃ অভিবাদন করিলেন, বাদ্য বাজনা করিয়া তাঁহাদের বাটীতে লইয়া গেলেন এবং রাজসম্মান সহকারে ইঁহাদের সম্বর্দ্ধনা ও ভোজনাদির প্রচুর আয়োজন করিলেন। বৈকুণ্ঠ বাবু অতি বিনয়ী এবং বিলক্ষণ বৈষয়িক ক্ষমতাপন্ন জমিদার। বরিশাল জেলার মধ্যে তাহাদের সম্পত্তির আয় সমুদয় জমিদার ও তালুকদারের আয় অপেক্ষা অধিক। বৈকুণ্ঠ বাবুর পিতামহ প্রাণনারায়ণ ও প্রতাপনারায়ণ

বিশ্বাস সেজরাজা ও ছোটরাজার বৃদ্ধপ্রপিতামহ জয়নারায়ণ ও প্রপিতামহ শিবনারায়ণের চাকুরী করিয়াই অনেক ভূসম্পত্তি লাভ করেন। সেই জন্যই ঐ বিশ্বাসবংশধরগণ অদ্যাপি রায়েরকাঠীস্থ রাজবংশের সকলকেই যথেষ্ট সম্মান করিয়া আসিতেছেন। বাবু বৈকুণ্ঠনাথ বিশ্বাস সেজরাজার মধ্যমপুত্র নগেন্দ্রনারায়ণকে বিশেষ ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন। যখনই তাঁহার সহিত দেখা হইত বিনয় সহকারে নজর প্রদান করিতেন ও বলিতেন "আপনাদের আশীর্ব্বাদই আমাদের ভাগ্যলক্ষ্মীর প্রধান কারণ। আমরা যখন আপনাদের সম্মান করিব না তখন আমাদের কিছুই থাকিবে না। আপনাদের পূর্ব্বপুরুষের অনুগ্রহই আমাদের এই সকল উন্নতির মূলীভূত কারণ।"

মাধবনারায়ণের জ্ঞাতি রাজা নরেন্দ্রনারায়ণের বংশধরগণ এই সময়ে ঘোরতর আত্মকলহে প্রবৃত্ত হ'ন। তাঁহারা খুলনা জেলার অন্তর্গত বনগ্রামে বাস করিতেছিলেন। বাগেরহাটের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট রামচরণ দত্ত মহাশয় অনেক চেষ্টা করিয়াও এই বিবাদ মিটাইতে পারিলেন না। এই সময়েই মাধবনারায়ণের মহল চিংড়াখালি গ্রামের প্রজাদিগের একটী ফৌজদারী মোকদ্দমা হয়। রামচরণ বাবু তাহাদিগকে বলেন,—তোমরা একপক্ষ মাধবনারায়ণকে সাক্ষী মান্য কর। তাহারা তাহাই করিল এবং যথাসময়ে আদালতে হাজির হইবার জন্য মাধবনারায়ণের নিকট সাক্ষীর শমনও প্রেরিত হইল। মাধবনারায়ণ 'শরীর অসুস্থ সুতরাং আদালতে হাজির হইতে পারিব না' এই মর্ম্মে এক দরখাস্ত পেশ করিলেন। কিন্তু তাঁহার দরখাস্ত অগ্রাহ্য হইল। মাধবনারায়ণ তখন বাধ্য হইয়া নৌকাযোগে বাগেরহাটে উপস্থিত হইলেন। ডেপুটী বাবুও তাঁহার আগমন-সমাচার পাইয়া নৌকায় যাইয়াই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং বলিলেন,—"আপনাকে

এখানে আনিয়া বড়ই কষ্ট দিয়াছি, এজন্য আমাকে ক্ষমা করিবেন। আপনার জ্ঞাতিগণ পরস্পর বিবাদ করিয়া ধ্বংশ প্রাপ্ত হইতে চলিয়াছেন, আপনি ব্যতীত তাঁহাদের বিবাদ অপর কেহ মিটাইতে পারিবে না।” বাস্তবিকই রামচরণ বাবুর মত বিচক্ষণ ডেপুটী অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। কেবল আইন অনুযায়ী বিচার করিয়া রায় লিখিলেই প্রকৃত বিচারক হওয়া যায় না, লোকের সহিত মিলামিশা করিয়া বিচার্য্য বিষয়ের প্রকৃত তথ্য অবগত হওয়া বিচারকের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয়। এই উপায়ে অনেক সময়ে অভিজ্ঞ বিচারকগণ সূক্ষ্ম বিচার করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। অনেক সময়ে দেখা যায়, বিচার লাভের জন্য মোকদ্দমায় প্রবৃত্ত হইয়া উভয় পক্ষই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। দুই পক্ষকে ধ্বংস পথে প্রেরণ করিবার সুযোগ দিলেই যে বিচারের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হয় তাহা নহে ; দুই পক্ষকে বজায় রাখিয়া যাহাতে বিচারকার্য্য নিষ্পন্ন হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখিয়া যিনি বিচার করিতে পারেন তিনিই প্রকৃত বিচারক। রামচরণ বাবুর হৃদয়ে প্রকৃত বিচারকের গুণাবলী বিদ্যমান ছিল। তিনি উভয় পক্ষকে ডাকাইয়া মাধবনারায়ণকে সালিশ মান্য করিতে বলিলেন। তাঁহারাও সানন্দ চিত্তে মাধবনারায়ণকে সালিশ মানিয়া লইলেন।

রামচরণ বাবু আপন বাসায় মাধবনারায়ণকে নিমন্ত্রণ করিলেন। তাঁহার বাসায় অনেক উকীল, মোক্তার এবং মুন্সেফ প্রভৃতির সহিত মাধবনারায়ণের পরিচয় করাইয়া দিলেন। তাঁহারা সকলেই মাধব-নারায়ণের সহিত আলাপ করিয়া পরম প্রীত হইলেন। অতঃপর তিনি রামচরণ বাবুর নিকটে বিদায় গ্রহণ করিয়া রায়েরকাঠীতে ফিরিয়া আসিলেন। প্রত্যাবৃত্ত হইবার ৭।৮ দিন পরেই বনগ্রামের জ্ঞাতিগণ তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য উপযুক্ত লোক পাঠাইলেন। তিনিও

তাঁহার সহিত বনগ্রামে উপস্থিত হইলেন। জ্ঞাতিগণ তাঁহার উপস্থিতিতে অতীব আনন্দিত হইলেন এবং সকলেই যথেষ্ট আদর অভ্যর্থনা করিলেন। প্রত্যেকেই পর্য্যায়ক্রমে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভূরি ভোজনে পরিতৃপ্ত করিলেন। মাধবনারায়ণ সবিশেষ দক্ষতার সহিত নিরপেক্ষ ভাবে তাঁহাদের বিবাদ মিটাইয়া দিলেন। তাঁহারা সকলেই তাঁহার ন্যায়পরায়ণতা ও পক্ষপাতপরিশূন্য বিচারবুদ্ধির ভূয়সী প্রশংসা করিলেন।

সেজরাজা শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় অতি ধার্ম্মিক এবং সত্যনিষ্ঠ লোক ছিলেন। তিনি চৈতন্যদেবের দীক্ষা-দাতা কেশব ভারতীর বংশধর। এই বংশের অবিলম্ব সরস্বতী সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। ইঁহারা রায়েরকাঠীস্থ রাজবংশের দীক্ষা গুরু। শ্রীযুক্ত জগৎচন্দ্র ভট্টাচার্য্য সেজরাজার পুরোহিত ছিলেন। এই বংশের মহাত্মা রাজা জয়নারায়ণ তার-পাশা গ্রামে ইঁহাদের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করেন। ইঁহারা অদ্যাপি রাজ-পুরোহিত বলিয়া অভিহিত হইতেছেন।

মাধবনারায়ণের প্রকৃতি গম্ভীর এবং ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা তাঁহার আজীবন সহচর ছিল। মহা বিপদে পতিত হইলেও তিনি ধৈর্য্যচ্যুত হইতেন না। বিপদ্ উপস্থিত হইলে যেন কিছুই ঘটে নাই এইভাবে কোন প্রকার চাঞ্চল্য প্রকাশ না করিয়াই তিনি নিজ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া যাইতেন। তিনি প্রায়ই বলিতেন,—'যে বিপদের মধ্যে একটি রাত্রিও পাওয়া যায় সে বিপদকে বিপদ জ্ঞান করা যায় না, কারণ এক রাত্রিতে কি না ঘটিতে পারে? সুতরাং বিপদে অভিভূত হইয়া পড়া কাহারও উচিত নহে।' তিনি সদা প্রফুল্ল ছিলেন, কেহ কখনও তাঁহাকে বিষণ্ন দেখে নাই। তিনি যেরূপ সুশ্রী ও বলিষ্ঠ ছিলেন, সেইরূপ সাহসীও

ছিলেন। যৌবনে তিনি নিয়মিত ব্যায়াম করিতেন। মল্ল-ক্রিয়ায় এবং বন্দুক ও তীর চালনায় তিনি সবিশেষ অভ্যস্ত ছিলেন। গভীর বনে প্রবেশ করিয়া শিকার করিতে তিনি বড়ই ভাল বাসিতেন। তাহার শিকারে হত হরিণের শৃঙ্গ ও গণ্ডারের খর্গের কোষা কোশী অদ্যাপি তাঁহার বাটীতে বিদ্যমান আছে। ব্যাঘ্র, মহিষ, হরিণ, কুম্ভীর প্রভৃতি তিনি যে কত শিকার করিয়াছিলেন তাহার সংখ্যা হয় না। ডাহুক, কোড়া, শিকরা ও তুরমতী প্রভৃতি পক্ষীর শিকার দেখিতে তিনি খুব ভাল বাসিতেন। অনেক লোক এই সকল পাখী লইয়া তাঁহার নিকটে আসিত এবং উহাদের শিকার দেখাইয়া তাঁহার আনন্দ বিধানের চেষ্টা করিত। তিনি শিকারী পাখীগুলির গুণানুসারে মালিকদিগকে পুরস্কার দিতেন। তিনি পাখীর লড়াই দেখিতে এবং পাখী ও জীবজন্তু পোষিতে বড়ই ভাল বাসিতেন। বুলবুল ও তিত্তুর পাখী পুষিয়া তিনি উহাদের লড়াই দেখিতেন। তাঁহার বাড়ীতে যে কাকাতুয়া, হিরামন, ভীমরাজ প্রভৃতি পক্ষী এবং পোষা কুকুর, হরিণ, খরগোস, গিনিপিগ প্রভৃতি ছিল, এই গুলিকে তিনি সবিশেষ যত্ন করিতেন।

বাঙ্গলা ১২৯৩ সালে মাধবনারায়ণ মধুমেহ রোগাক্রান্ত হন। ডাক্তার ও কবিরাজগণের সুচিকিৎসায় তিনি প্রথমে অনেকটা সুস্থ হইয়া উঠিলেন বটে, কিন্তু সকলেই বলিতে লাগিলেন যে, এ রোগ একেবারে দূর হইবার নয়। এই কথা শুনিয়া তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহার জীবদ্দশাতেই পুত্র নগেন্দ্রনারায়ণের বিবাহ দিলেন। তিনি স্বয়ং এই বিবাহে কলিকাতায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। বিবাহের ভার তাঁহার শ্যালিকা হেমাঙ্গিনী ও শ্বশুর মহাশয়ের উপরেই ন্যস্ত করিলেন এবং তাঁহাদের তত্ত্বাবধানেই শুভ বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল। এই শ্যালিকাই ঠনঠনিয়ার হেরম্ব দাস মহাশয়ের স্ত্রী শ্রীযুক্তা

হেমাঙ্গিনী। তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ও কর্ম্মকুশলা ছিলেন। মাধবনারায়ণ বিবাহ অনুষ্ঠানে আভ্যুদয়িক কার্য্য করিবার জন্য রায়েরকাঠী হইতে তাঁহার জ্ঞাতি-ভ্রাতা শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর রায় চৌধুরীকে এবং দেওয়ান কাশীশ্বর সিংহরায়, পুরাতন বিশ্বাসী ভৃত্য মহিমচন্দ্র ও পরিচারিকা মুক্তকেশীকে কলিকাতায় পাঠাইয়া ছিলেন। মহিমচন্দ্র ও মুক্তকেশী উভয়েই নগেন্দ্রনারায়ণকে প্রতিপালন করিয়াছিল। * ১২৯৩ সালের শ্রাবণ মাসে ঠন্‌ঠনিয়া-নিবাসী নির্দ্দোষ মধ্যাংশ দ্বিতীয়ের পো কুলীন পূর্ণচন্দ্র বসু মহাশয়ের মধ্যমা কন্যা শ্রীমতী বসন্তকুমারীর সহিত নগেন্দ্রনারায়ণের বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হয়। বসু মহাশয় কন্যা ও জামাতাকে স্বর্ণ, রৌপ্য ও মুক্তার বহুবিধ অলঙ্কার, মূল্যবান বরসজ্জা, বিস্তর তৈজসপত্র প্রদান করিয়াছিলেন। বসন্তকুমারীর অন্য নাম ছিল মনোরমা। বিবাহের পর মাধনারায়ণের লোকজন ও শ্রীযুক্তা হেমাঙ্গিনী বর-বধূকে সঙ্গে লইয়া রায়েরকাঠীতে আগমন করিলেন। মাধবনারায়ণ পুত্রবধূকে জোলাগাতি নামক তালুক হইতে ১০০৲ টাকা আয়ের সম্পত্তি ও ১খান মোহর যৌতুক স্বরূপ দান করেন †। বসন্তকুমারী ‡ প্রথম যাত্রাতেই শ্রদ্ধা-ভক্তি ও সেবা-যত্ন দ্বারা শ্বশুর ও শ্বশ্রূ-

* এতদ্ব্যতীত পদ্মমণি নাম্নী পরিচারিকাও নগেন্দ্রনারায়ণ ও তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুরেন্দ্রনারায়ণকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন।

† পিতার মৃত্যুর পর শ্রীযুত নগেন্দ্রনারায়ণ ভ্রাতৃস্নেহ বশতঃ ঐ সম্পত্তি ভ্রাতাদিগের সহিত তুল্য ভাগে বিভক্ত করেন।

‡ বসন্তকুমারীর মৃত্যুর পর তাঁহার স্বামী নগেন্দ্রনারায়ণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে "বসন্তকুমারী চৌধুরাণী প্রাইজ" নামক এক পুরস্কার দানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। বরিশাল জেলার ছাত্র ও ছাত্রীদের মধ্যে যে কেহ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় সংস্কৃতে প্রথম স্থান অধিকার করিবে, সেই এই পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বসন্তকুমারী আদর্শচরিত্রা ছিলেন বলিয়া সিটিকলেজের প্রধান সংস্কৃতাধ্যাপক পণ্ডিত উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ তাঁহার জীবন-চরিত রচনা করিয়াছেন।

ঠাকুরাণীর স্নেহ ও প্রীতি আকর্ষণে সমর্থা হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্তা হেমাঙ্গিনী কিছুদিন রায়েরকাঠীতে অবস্থান করিয়া বসন্তকুমারী ও নগেন্দ্রনারায়ণের সহিত কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

৩

শ্রাবণ মাস এইরূপে বিবাহ-ব্যাপারেই অতিবাহিত হইল। ভাদ্র-মাসে মাধবনারায়ণ বেশ সুস্থ হইয়া উঠিলেন। এই সময়ে কেহ তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার শরীরে কোনও রোগ আছে ইহা বলিতে পারিত না। কেওরা গ্রাম-নিবাসী বিখ্যাত ডক্তার ও কবিরাজ শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সেন কবীন্দ্র ও ঝাউকাঠি নিবাসী ডাক্তার শ্রীযুক্ত কালীকান্ত সেন মহাশয়ের সুচিকিৎসাগুণে তিনি এইরূপ আরোগ্যলাভ করেন। ইঁহারা ব্যতীত তাঁহার গৃহ-চিকিৎসক রায়েরকাঠী-নিবাসী শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয় প্রতিনিয়তই তাঁহাকে দেখা-শুনা করিতেন। ক্রমে ক্রমে আশ্বিন মাসে তিনি পূর্ণ সুস্থকায় ও বলিষ্ঠ হইলেন। এই সময়ে জৌশিরকাঠি-নিবাসী প্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র সেন কবিরত্ন মহাশয় মাধবনারায়ণকে দেখিয়া শুনিয়া বলেন, —"আমার বিবেচনায় এইরূপ আরোগ্য প্রকৃত আরোগ্য নহে। রোগ ভাল হইলে শরীর শুষ্ক হইত। ঔষধের গুণে কেবল বাহিরে বাহিরে শরীর ভাল দেখাইতেছে বটে; কিন্তু ভিতরে রোগের মূল এখনও রহিয়া গিয়াছে। উহা আবার দেখা দিতে পারে; তবে ভগবান যদি দয়া করেন তাহা হইলে স্বতন্ত্র কথা।" বস্তুতঃ তাঁহার কথা ফলিয়া গেল। কোজাগর লক্ষ্মীপূজার পর রোগ আবার দেখা দিল। প্রথমে মাধবনারায়ণ সামান্যরূপ অসুস্থতা বোধ করিলেন; কিন্তু ১০।১৫ দিনের মধ্যেই রোগ উৎকট হইয়া দাঁড়াইল। প্রসিদ্ধ ডাক্তার কালীকান্ত সেন ও কবিরাজ দুর্গাচরণ সেন কবীন্দ্র মহাশয়কে আহ্বান

করা হইল। তিনি রোগীকে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন,—“রোগীর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন, আশা-ভরসা বড় কম।” প্রসিদ্ধ কবিরাজ বৃন্দাবন সেন কবিরত্ন মহাশয়কেও আনয়ন করা হইল। তিনিও ঐ একই কথা বলিলেন। সকলে প্রাণপণ চেষ্টায় চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। লক্ষণ কিছুই ভাল দেখা যাইল না। রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইলে লাগিল। বিধাতার-বিধানে যে কালরোগ মাধবনারায়ণের শরীরে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে ইহলোক হইতে অপসারিত করিবে বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে, সে রোগের চিকিৎসা করিবে কে? স্বয়ং ধন্বন্তরি আসিয়া চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিলেও বিধাতার বিধান খণ্ডন করা অসম্ভব। পরপার হইতে মাধবনারায়ণের ডাক আসিয়াছিল। সে ডাক ব্যর্থ হইবার নয়। অথবা অমরধামের কোনও কার্য্যের জন্য মাধবনারায়ণের ন্যায় ন্যায়-পরায়ণ, সত্যনিষ্ঠ, ধার্ম্মিক ব্যক্তির প্রয়োজন হইয়াছিল বলিয়া দেবতারা তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছিলেন। দেবতাদের আহ্বান কি প্রত্যাখ্যাত হইতে পারে? কাজেই মানুষের চিকিৎসা ব্যর্থ হইল। অবশেষে ১২৯৩ সালের ১০ই অগ্রহায়ণ রাত্রি ১১ ঘটিকার সময়ে মাধবনারায়ণ পরিবারবর্গ, বন্ধুবান্ধব ও বরিশাল জেলার লোকদিগকে শোক-সাগরে নিমজ্জিত করিয়া ইহলোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক অমরধামে প্রস্থান করিলেন। যে দীপ্তিমান্ জ্যোতিষ্কের উজ্জ্বল দ্যুতিতে সমগ্র বরিশাল জেলা আলোকিত ছিল তাহা চিরকালের জন্য নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইল। আবাল বৃদ্ধ বনিতা মাধবনারায়ণের পরলোক-গমনে প্রিয়-বিয়োগ বেদনা অনুভব করিল এবং অশ্রুপাত করিতে লাগিল। এই শোক-সংবাদ বিদ্যুৎগতিতে সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইল। নরনারী-নির্ব্বিশেষে দলে দলে লোক আসিয়া রায়েরকাঠীর রাজবাড়ীতে সমবেত হইতে লাগিল। সকলেই শ্মশানযাত্রার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। তাঁহার শবানুগমনে

যেরূপ বিপুল লোক-সমাগম হইয়াছিল তাহা এতদঞ্চলে অতি অল্পই দৃষ্ট হয়।

এইরূপ পরোপকারী নিয়ত আশ্রিতবৎসল অতিথিসেবা-পরায়ণ মাধবনারায়ণের পরলোক-প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে দেশ হইতে সমুদায় সদাচার লোপ হইয়া গেল মনে করিয়া গ্রামস্থ, জেলাস্থ সকলে পরম বিষাদাপন্ন হইয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন।

এক মাস অতীত হইলে পর তাঁহার উপযুক্ত পুত্রগণ যথাবিধানে শ্রাদ্ধকার্য্য সুসম্পন্ন করিলেন। শ্রাদ্ধে শালগ্রাম, ঘোড়া, পাল্কী নৌকা বিলক্ষণা দান ষোড়শ, মসলন্দ, বৃষোৎসর্গ, তোরণকল্পবেদী প্রভৃতি কোন অনুষ্ঠানেরই ত্রুটী হয় নাই। নিমন্ত্রিত, অনিমন্ত্রিত, দূরদেশাগত লোকদিগকে ও গ্রামস্থ সকল শ্রেণীর লোককে ভূরিভোজনে পরিতৃপ্ত করা হইয়াছিল। *

সম্পূর্ণ।



* পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ ভোজনে দক্ষিণা দুই আনা কি চারি আনা ছিল। মাধবনারায়ণের পুত্রগণ এই প্রথম ॥• আনা ভোজন-দক্ষিণা দিলেন। এখন যাঁহারা বড়রকম শ্রাদ্ধ করেন তাঁহারা ব্রাহ্মণভোজনে ॥• আনা দক্ষিণা দিতেছেন।

উপসংহার।

মাধবনারায়ণ তাঁহার মৃত্যু সন্নিকট জানিয়া মৃত্যুর ২৩ দিন পূর্ব্বে একটী উইল করিয়া যান। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল যাহাতে এষ্টেটটী একত্র থাকে এবং পূজা প্রভৃতি ক্রিয়া-কর্ম্মগুলির সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হয়। বিশেষতঃ দ্বিতীয় পক্ষের তিনটী পুত্রই তখন নাবালোক ছিল। তখন পর্য্যন্ত তাঁহাদের চূড়াকরণ বিবাহ ইত্যাদি কিছুই হয় নাই। মাধবনারায়ণ উইলে তাঁহার পত্নী শ্রীযুতা জগৎমোহিনী চৌধুরাণীকে তাঁহার জীবিতকাল পর্য্যন্ত এষ্টেটের একজিকিউট্রিক্স্ নিযুক্ত করেন। পুত্রগণ আবশ্যকীয় ব্যয় এবং বিবাহাদি কার্য্যের ব্যয় এষ্টেট্ হইতে পাইবেন; কিন্তু পুত্রগণ পৃথক্ অন্ন হইলে কেবলমাত্র চূড়াকরণ ও বিবাহের ব্যয় ও নির্দ্দিষ্ট মাসহারা পাইবেন।

মাধবনারায়ণের মৃত্যুর পর তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র, কর্ম্মচারী ও কোন কোন আত্মীয়-স্বজনের প্ররোচনায়, উইল জাল বলিয়া মোকদ্দমা করেন। উইলে বিশিষ্ট ডাক্তার কবিরাজ এবং জ্ঞাতিগণ স্বাক্ষী ছিলেন বলিয়া বরিশাল জজকোর্টেই উইল সাব্যস্ত হইল। তবুও হাইকোর্ট পর্য্যন্ত মোকদ্দমা চলিবাব বাধা হয় নাই। জেলাকোর্টের মোকদ্দমায় বরিশালের খ্যাত-নামা শ্রেষ্ঠ উকিল বাবু প্যারীলাল রায়, বাবু দীনবন্ধু সেন, মৌলবী ওয়াজেদ মিঞা, রায় বাহাদুর দ্বারিকানাথ দত্ত প্রভৃতি উভয় পক্ষে নিযুক্ত ছিলেন। হাইকোর্টের মোকদ্দমায়ও বাবু শ্রীনাথ দাস, বাবু রাসবিহারী ঘোষ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ উকিলগণ উভয় পক্ষে নিযুক্ত হইয়া-ছিলেন। মোকদ্দমায় উইল প্রমাণিত হইল এবং জগৎমোহিনী

চৌধুরাণীর জিত হইল। ফৌজদারী ও অন্যান্য দেওয়ানী মোকদ্দমাও যথেষ্ট হইয়াছিল। লাঠীয়াল খরচাও কম হয় নাই। এই গৃহবিবাদ চারি বৎসর চলিয়াছিল। তাহাতে উভয় পক্ষের ৪০০০০৲ টাকার ক্ষতি হইয়াছিল।

পিরোজপুর সভ্ ডিভিসনের খ্যাতনামা ডিপুটি বাবু শশীশেখর দত্ত এবং ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য উকিল বাবু দীননাথ দাস রায়েরকাঠী আসিয়া প্রথমে ইহাদিগের মীমাংসার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। তখন কিছুতেই কিছু হইল না। গ্রামস্থ মাধবনারায়ণের প্রিয় সুহৃদ্ ও জ্ঞাতি শ্রীযুক্ত অদ্বৈত নারায়ণ রায় চৌধুরী এবং ষষ্টিবর মিত্র মহাশয়ও মীমাংসার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহাতেও মীমাংসা হইল না। জ্যেষ্ঠপুত্র গিরীন্দ্রনারায়ণ অতি সরলবিশ্বাসী লোক, পরে দুষ্ট লোকের চক্রান্ত বুঝিলেন এবং মীমাংসার জন্য উদ্‌যোগী হইলেন। মাধব-নারায়ণের মধ্যম পুত্র নগেন্দ্রনারায়ণ ও বরিশালের খ্যাতনামা উকিল মৌলবি ওয়াজেদ্ মিঞার একান্ত চেষ্টা ও পরিশ্রমে ১২৯৭ সালের ৭ই আষাঢ় গিরীন্দ্র নারায়ণের সহিত সম্পত্তি বিভাগ হইয়া মীমাংসা হইয়া গেল। এই বিবাদ উপলক্ষে কোন কোন কর্ম্মচারী বিশ্বাসঘাতকতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছিল। প্রজাদিগেরও অনেকে একপক্ষ ছাড়িয়া অপর পক্ষে এবং অপর পক্ষ ছাড়িয়া অন্য পক্ষে যোগদান করিত।

গিরীন্দ্রনারায়ণকে সম্পত্তি বিভাগ করিয়া দেওয়ার পর ১৩১৪ সাল পর্য্যন্ত শ্রীযুক্তা জগৎমোহিনী চৌধুরাণী তাহার গর্ভজাত চারিপুত্র নগেন্দ্র-নারায়ণ, যতীন্দ্রনারায়ণ, জীবেন্দ্রনানায়ণ এবং সুরেন্দ্রনারায়ণের পক্ষে একজীকিউট্রিক্‌স্ ছিলেন। শ্রীযুক্তা জগৎমোহিনী চৌধুরাণী একজি-কিউট্রিক্‌স্ থাকিবার সময় তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র নগেন্দ্রনারায়ণ এষ্টেটের কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। গিরীন্দ্রনারায়ণের সহিত বিভাগ সময়ে ষ্টেটে ২০০০০



মাধবনারায়ণের স্ত্রী শ্রীযুক্তা জগৎমোহিনী চৌধুরাণী
৬২ বৎসর বয়ঃক্রমের প্রতিমূর্ত্তি।

টাকার দেনা ছিল। মাধবনারায়ণের মৃত্যুর সময় প্রায় ১২০০০৲ টাকা ঋণ রাখিয়া যান। তৎপর এই বিবাদে ঋণের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। গিরীন্দ্রনারায়ণ তাঁহার অংশের দেনার দরুণ কতেক সম্পত্তি ভ্রাতাদিগকে ছাড়িয়া দিয়া নির্দ্দাইক্ অবস্থায় বাকি সম্পত্তি গ্রহণ করেন। নগেন্দ্রনারায়ণ এই গুরুতর দেনা সত্বেও বাৎসরিক ২০০০৲ টাকা আয়ের সম্পত্তি বৃদ্ধি করিয়াছিলেন এবং দেনাও প্রায় অনেক পরিশোধ করিয়াছিলেন। পিতার নামে কোন দেনা রাখিলেন না, সকল দেনা নিজেদের নামে করিয়া লইলেন। ভ্রাতাগণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছে দেখিয়া নগেন্দ্রনারায়ণ ভ্রাতাদিগের চূড়াকরণ প্রভৃতি কার্য্য সম্পাদন করেন এবং বনগ্রাম নিবাসী কোমল মুখ্য কুলীন বাবু সত্যচরণ বসু মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী পঙ্কজিনী চৌধুরাণীর সহিত যতীন্দ্রনারায়ণের, রায়েরকাঠী নিবাসী কোমল মুখ্য কুলীন চন্দ্রকান্ত বসুর কন্যা অক্ষয়কুমারীর সহিত জীবেন্দ্রনারায়ণের এবং বাঘুটিয়া গ্রাম নিবাসী সহজ মুখ্যাগ্রগণ্য রাজেন্দ্রকুমার ঘোষের কন্যা হেমবালার সহিত সুরেন্দ্রনারায়ণের শুভ বিবাহকার্য্য সম্পন্ন করাইলেন। এই সকল বিবাহ উপলক্ষে ভোজনাদিতে অনেক টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন।

শ্রীযুতা জগৎমোহিনী চৌধুরাণী রায়েরকাঠী থাকিতে যে সকল ব্রত উদ্‌যাপন করিয়াছেন তন্মমধ্যে ধর্ম্মঘটের ব্রতই উল্লেখযোগ্য। ঐ ব্রতোপলক্ষে গ্রামস্থ সমুদয় ব্রাহ্মণ, দেশের দক্ষিণ রাঢ়ীয় সমাজস্থ সকল এবং ভিন্ন শ্রেণীস্থ অনেক লোককে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করাইয়াছিলেন। দেশস্থ প্রত্যেক ব্রাহ্মণ ঘরে ১টী করিয়া পিত্তলের কলসী প্রদান করেন। ইহা ব্যতীত আরও অনেক ব্রাহ্মণকে অনেক পিতলের কলসী প্রদান করিয়াছিলেন। তরুণ-কল্প বেদী করিয়া প্রতিষ্ঠা কার্য্য সমাপন করেন। ইহাতে অনেক টাকা ব্যয় হইয়াছিল।

মাধবনারায়ণের মৃত্যুর সময় নগেন্দ্রনারায়ণের বয়স ১৯ বৎসর পূর্ণ হয় নাই। এই অল্প বয়সে তাঁহার সর্ব্বগুণালঙ্কৃত পিতার মৃত্যুতে নগেন্দ্রনারায়ণ বড়ই কাতর হইয়া পড়িলেন। এ দিকে ভ্রাতাগণও তখন পর্য্যন্ত নাবালক। তাহাতে আবার ভয়ঙ্কর গৃহ বিবাদ ও জ্ঞাতি-বিরোধ। ইহার উপর এষ্টেট্‌টী দেনায় জড়িত। এই অবস্থায় এষ্টেট্‌ রক্ষার জন্য তাঁহাকে অমানুষিক পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। ক্রমিক নগেন্দ্রনারায়ণের শরীর ভগ্ন হইল ও দেহ রোগাক্রান্ত হইল। তাঁহার কোন সন্তান ছিল না। তিনি মনে করিয়াছিলেন ভ্রাতারা কার্য্যক্ষম হইলে তাহাদের প্রতি সম্পত্তির-পর্য্যবেক্ষণের ভারার্পণ করিয়া তীর্থাদি পরিভ্রমণ করিবেন ও নিজ চিকিৎসা করাইবেন। এক্ষণে ভ্রাতাদিগকে উপযুক্ত দেখিয়া তিনি ভ্রাতাদিগের মধ্যে জীবেন্দ্রনারায়ণকে বৈষয়িক কার্য্যক্ষম জানিয়া তাঁহার প্রতি সম্পত্তি পর্য্যক্ষেণের ভার প্রদান করেন। অবশ্য ইহাতে তাঁহাদের মাতা ও ভ্রাতা যতীন্দ্রনারায়ণের সম্পূর্ণ মত ছিল।

সন ১৩১২ সালে তিনি কলিকাতায় চলিয়া আসেন এবং তথায় থাকিয়া নিজ চিকিৎসা করাইতে আরম্ভ করেন ও মধ্যে মধ্যে তীর্থাদি পরিভ্রমণ করিতেন। মানুষ আশা করিতে পারে মাত্র, পূর্ণ করিবার কর্ত্তা এক ভগবান। নগেন্দ্রনারায়ণের আশা পূর্ণ হইল না। ক্রমে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও অন্যান্য ভ্রাতাদিগের মধ্যে পরস্পর বিশেষ মনোমালিন্য উপস্থিত হইল। তাহা শুনিয়া তিনি বাটী আসিলেন এবং ভ্রাতাদিগের মধ্যে যাহাতে পরস্পর সৌহার্দ্দ থাকে তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিলেন। এমন কি মাতামহ শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়ের দ্বারা পত্র লেখাইয়া ইঁহাদিগকে কলিকাতায় আনাইলেন এবং মীমাংসার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। একবার মীমাংসা হয় আবার বিবাদ বৃদ্ধি পায়। অবশেষে তিনি অনন্যোপায়



শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনারায়ণ ও তাহার পারিষদ বর্গ।
৫০ বৎসর বয়ঃক্রমের প্রতিমূর্ত্তি।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনারায়ণ।
৪৮ বৎসর বয়ঃক্রমের প্রতিমূর্ত্তি।

হইয়া সম্পত্তি-বিভাগের প্রস্তাব করেন। অনেক কষ্টে ও পরিশ্রমে সম্পত্তি-বিভাগ হইল। ইহাতেও আত্মীয় স্বজনগণের কেহ কেহ ক্ষতি করিতে পরাঙ্মুখ হন নাই। ইহাতে তাঁহাদের ১০০০৬ হাজার টাকার ক্ষতি হইয়াছিল। ইঁহাদের মাতা শ্রীযুক্তা জগৎমোহিনী চৌধুরাণী জিলার জজ সাহেবের অনুমতি লইয়া একজিকিউট্রিক্সের পদ পরিত্যাগ করিলেন এবং পুত্রদিগকে বিষয় সম্পত্তি এবং অস্থাবর জিনিষ পত্র সমুদয় বিভাগ করিয়া দিয়া ১৩১৪ সালের কার্ত্তিক মাসে কলিকাতায় আসিলেন। তদবধি তিনি কখনও নগেন্দ্রনারায়ণের সমভিব্যাহারে কখনও বা আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে নানা তীর্থ পরিভ্রমণ করিতেছেন। সেই সময় হইতে অদ্য পর্য্যন্ত তিনি আর কখনও রায়েরকাঠীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই।

শ্রীযুক্তা জগৎমোহিনী চৌধুরাণী রায়েরকাঠীতে বাসকালে গঙ্গাসাগর ও ব্রহ্মপুত্র স্নানে গিয়াছিলেন। তখন ঢাকায় ঢাকেশ্বরী দর্শন করিয়াছিলেন। নগেন্দ্রনারায়ণ মাতাকে তাঁহার ভ্রাতা জীবেন্দ্র নারায়ণ, পুরোহিত, কর্ম্মচারী ও চাকর প্রভৃতিকে সঙ্গে দিয়া ঐ দুই তীর্থে পাঠাইয়াছিলেন। জগৎমোহিনী বাটী হইতে চলিয়া আসিবার পর হইতে চন্দ্রনাথ, কামেক্ষা, কাশী, অযোধ্যা, বিন্ধ্যাচল, জয়পুর, বৃন্দাবন, মথুরা, কনখল এবং কুম্ভমেলা উপলক্ষে হরিদ্বার ও প্রয়াগ প্রভৃতি মনুষ্যগম্য নানা তীর্থাদি পরিভ্রমণ করিয়াছেন ও এখনও করিতেছেন এবং তীর্থাদির শাস্ত্র-বিহিত-কার্য্য সকল সমাপন করিয়াছেন। কলিকাতায় আসিয়া তিনি দুইটী ব্রত উদ্‌যাপন করিয়াছেন। তাহাতেও ব্রাহ্মণ, আত্মীয়-স্বজন প্রভৃতিকে তৃপ্তি সহকারে ভোজন করাইয়াছেন। তাঁহার বয়ঃক্রম এখন ৮০ বৎসর। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তিনি রায়েরকাঠী হইতে চলিয়া আসিবার পর ক্রমিক তাহার তৃতীয়, চতুর্থ ও দ্বিতীয় পুত্র অকালে

কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। এখন তাঁহাদের পুত্র সকল বর্ত্তমান আছেন। শ্রীযুক্তা জগৎমোহিনী চৌধুরাণী নিতান্ত ধর্ম্মপ্রাণা ও সঞ্চয়-বুদ্ধিশালিনী। সংসারের কুটিলতা তিনি কিছুই বুঝেন না। এমন কি চাটুকারের তোষামদ-বাক্যে ভুলিয়া কখনও বিশ্বাসীকে অবিশ্বাস করেন এবং অবিশ্বাসীকে বিশ্বাস করেন। ইহাতে তাঁহার প্রভূত অর্থও নষ্ট হইয়াছে।

মাধবনারায়ণের জ্যেষ্ঠপুত্র গিরীন্দ্রনারায়ণ ও মধ্যমপুত্র নগেন্দ্রনারায়ণ এক্ষণে জীবিত আছেন। গিরীন্দ্রনারায়ণের তন্ত্র-শাস্ত্রে বিলক্ষণ অধিকার আছে। নগেন্দ্রনারায়ণ একজন ক্ষমতাশালী ও জনপ্রিয় জমিদার। তিনি দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনে কখনও পরাঙ্মুখ হ'ন নাই। ১৩২৫ সালে তাঁহার পত্নী-বিয়োগ হয়; তদবধি তিনি বিষয়-কার্য্য হইতে এক প্রকার অবসর হইতে ছিলেন। এক্ষণে একবারে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন এবং রায়েরকাঠী-বাসও একপ্রকার ত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট জীবন শান্তিতে যাপনের বাসনায় নানা তীর্থাদি পরিভ্রমণ করিতেছেন এবং সর্ব্বদা সদনুষ্ঠানে ব্রতী হইয়াছেন।

সম্পূর্ণ